# Prabanchak by Narayan sanyal

**For More Books Visit www.MurchOna.com**

**suman_ahm@yahoo.com**

# প্রবঞ্চক

স্থান : কাইজারগচ্—অর্থাৎ আমস্টার্ডাম শহরের একটি অভিজাত রাজপথ।
কাল : 25.5.1945 —অর্থাৎ বার্লিন বাঙ্কারে বিশ্বত্রাস হিটলারের আত্মহত্যা করার পঁচিশ দিন পরের কথা।
পাত্র : হান ভাঁ মীগরেঁ—অর্থাৎ বিংশশতাব্দীর সর্বকুখ্যাত প্রবঞ্চক।

কাটজ্জারগ্রচ্ রাস্তাটা—যদি Keizergracht এর সেটাই বাঙলার রূপান্তর হয়—শহরের কেন্দ্রস্থলে। প্রশস্ততম ক্যানালের কিনার বরাবর দুই সারি পপ্লার; দু পাশে দু-তিনতলা বাড়ি। একই স্থাপত্য শৈলীর। আমস্টার্ডাম শহরের এই এক মজা! তৈলখনির মালিক আরব শেখই হও আর মার্কিন মাল্টিমিলিয়নেয়ারই হও, ও-শহরে বাড়ি বানাতে হলে তোমার ইচ্ছামত পায়রা খোপ তৈরী করা চলবে না। নেদারল্যান্ডস্ স্থাপত্য-শৈলীর ডিজাইন না হলে সিটি-আর্কিটেক্ট বাড়িটি অনুমোদনই করবেন না। তাই শহরের রূপটা রয়ে গেছে অবিকৃত। ও সড়কে একটি বাড়িকেই বলা চলে প্রাসাদ—চারতলা প্রকাণ্ড সৌধ। তারই সিং-দরোজার সামনে এসে পুলিস-ভ্যানটা ব্রেক কষল। এগিয়ে এল য়ুনিফর্মধারী সশস্ত্র দ্বাররক্ষক—সসম্ভ্রম স্যালুট করে দেখতে চাইল পুলিসের সনাক্তিকরণ চিহ্নটা। পুলিসের গাড়িও ছাড়পত্র পায় না সহজে। সিনিয়ার পুলিস অফিসার ক্যাপ্টেন দুজঁ পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে দ্বাররক্ষকের নাকের ডগায় বাড়িয়ে ধরে দেখায় তার আইডেন্টিটি-কার্ড। বলে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করাই আছে। টেলিফোনে।
— জানি, স্যার। যান ভিতরে। —খুলে গেল প্রকাণ্ড লোহার গেটটা। সকাল তখন সাড়ে সাত। অর্থাৎ মে মাসেও আমস্টার্ডামে সেটা ভোর বেলা। পথ-ঘাট ফাঁকা। গাড়িটা ড্রাইভ-ইনে একটা চক্কর মেরে এসে থামল পোর্টিকোর তলায়। এখানেও কল-বেল বাজাতে হল না। এগিয়ে এল ভ্যালে। সুপ্রভাত জানালো। এবং সবিনয়ে দেখতে চাইল সেই সনাক্তিকরণ-চিহ্নটা। তারপর বললে, মালিক আপনাদের জন্য ড্রইং-রুমে অপেক্ষা করছেন।
পুলিস অফিসার দুজন অগ্রসর হবার উপক্রম করতেই পুনরায় বলে, দয়া করে এই খাতাখানায় দুজনে সই করে যাবেন।
ভ্রূকুঞ্চন হল দুজঁর। বললে, পুলিস-অফিসারদেরও ভিজিটার্স-বুকে সই দিতে হবে?
ও-পাশ থেকে ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে গৃহস্বামীর একান্ত সচিব।
সুপ্রভাত জানিয়ে সহাস্যে বলে, গতকাল শেষ দর্শনার্থী ছিলেন ফাইন আর্টস মন্ত্রকের সেক্রেটারি। তাঁর সইটা নিশ্চয় চিনবেন। —খাতাখানা মেলে ধরে দেখায়।
দুঁজ হাসল। সই দিয়ে বলে, এতটা সাবধানতার সত্যিই কি কোন প্রয়োজন আছে? এটা টাঁকশাল অথবা মিলিটারি আর্সেনেল তো নয়!
— তা ঠিক। তবে কি জানেন, এখানে এমন কিছু আছে যা টাঁকশাল পয়দা করতে পারে না। শুধু ধ্বংসই করতে পারে মিলিটারি আর্সেনেল।
—বস্তুটা কী? —দুজঁ কৌতুহল দেখায়।
— অরিজিনাল রাফায়েল, রুবেন্স, রেমব্রান্ট, রেনোয়াঁ!
— অর্থাৎ 'R'-এর অ্যালিটারেশন?

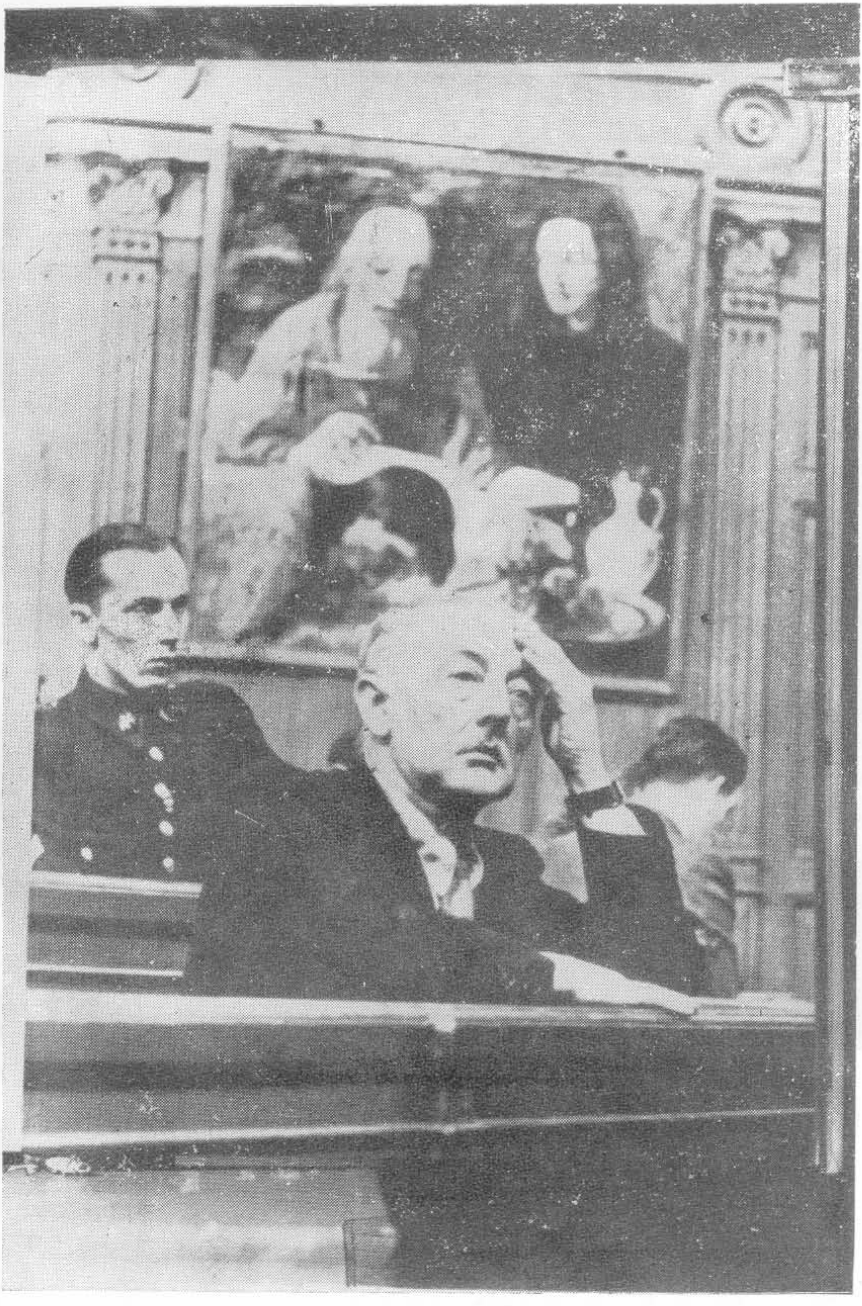

বিচারালয়ে আসামী হান ভাঁ মীগেরেঁ পিছনের দেওয়ালে
তাঁরই আঁকা নকল ছবি।

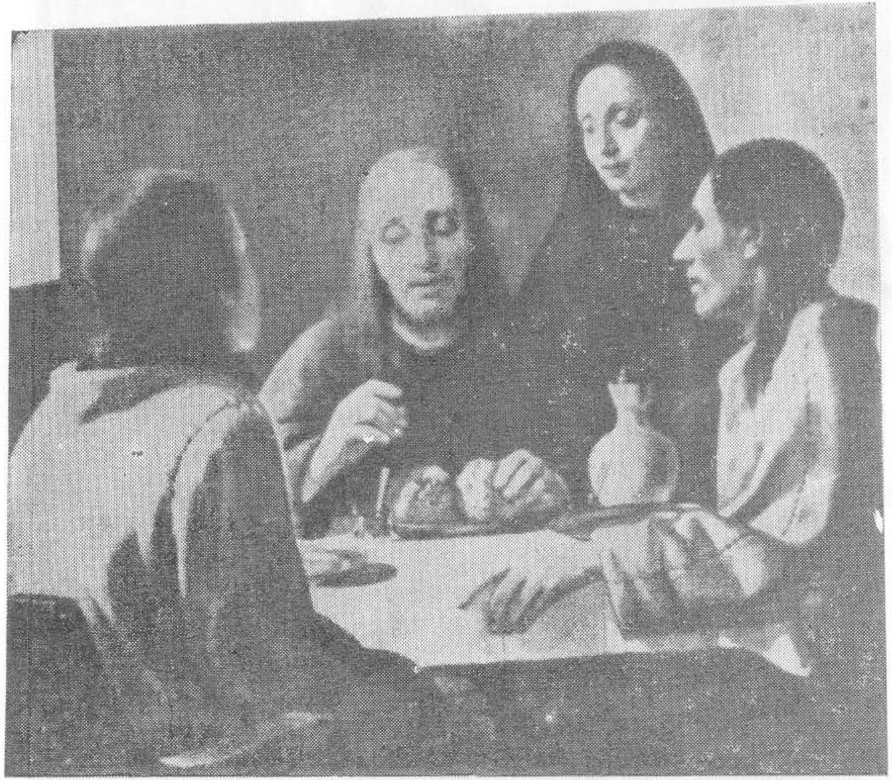

'ইস্মায়ুস'-এর পান্থশালায় যীশু—কারাভাগ্গো

'ইস্মায়ুস'-এর পান্থশালায় যীশু – নকল ভেরমেয়ার (মীগেরেঁ-কৃত)

পুলিস প্রহরায় মীগেরেঁ 'যুবক-যীশু' আঁকছেন

— শুধু 'R' নয় স্যার। যে কোন অক্ষরের। 'R' এর বদলে 'M' বেছে নিলে পাবেন : মিকেলাঞ্জেলো, মানে, মনে, মাতিস্!
বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়ে দুর্জঁ।
অগ্রসর হতে যাবে—পাশ থেকে একান্ত সচিব পুনরায় প্রশ্ন করে, মাপ করবেন ক্যাপ্টেন দুঁজ, কতটা সময় লাগবে আপনাদের? অর্থাৎ মস্যুয়ে মীগেরেঁ ঠিক সকাল সাড়ে আটটায় ব্রেকফাস্ট সারেন, আর সকাল নয়টায় ওঁর একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে—কাউন্ট অ্যান্ড কন্টাসিনা...
দুঁজ হাত-ঘড়িটা এক-নজর দেখে নিয়ে সহকারীকে প্রশ্ন করে, কতটা সময় লাগতে পারে দুমা?
দুমা চিবুকটা চুলকে বলল, তিন থেকে চার মিনিট! কী বল?
দুঁজ গম্ভীরভাবে সায় দেয়। সচিবের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, সঠিক হিসাব করা মুশ্কিল। তবে আমাদের প্রশ্ন একটাই, সেটা পেশ করতে আমাদের লাগবে মিনিট তিনেক, ওঁর জবাব দিতে দশ সেকেন্ড। এখন কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। দেখা যাক।
একান্তসচিব স্মিতহাস্যে বললে, না, না, অত সংক্ষিপ্ত না হলেও বাইবেল অশুদ্ধ হবে না। আপনারা মিনিট-পনের সময় অনায়াসে নিতে পারেন।
দুঁজ বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে, থ্যাঙ্ক স্যার! এতটা সময় দেবেন ভাবতেই পারিনি।
পিতৃদত্ত নাম : অঁরিকুস্ আন্তোনিয়ুস্ ভাঁ মীগেরেঁ। সংক্ষেপে হান মীগরেঁ। বয়স বছর-ছাপ্পানো। ছোট্টখাট্টো মানুষ। দেখলে বোঝা যায় জীবনে সাফল্যলাভ করেছেন আশাতিরিক্ত। মাথার চুলগুলি দুধ-সাদা। আমস্টার্ডাম শহরের সর্ববিখ্যাত আর্টডীলার তথা আর্ট-কনৌশার তথা আর্টিস্ট। সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্র-ব্যবসায়ী আরও অনেক আছেন, চিত্র সমঝদারও যথেষ্ট—যাঁরা ওঁর চেয়ে নামকরা। ওঁর চেয়ে বিখ্যাত আর্টিস্ট তো কয়েক ডজন। তবু ঐ! তিন-তিনটি গুণের সমন্বয়ে—আরও না-জানি কী কারণে— মীগেরেঁ সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাবান। তার অর্থ : অর্থ! জীবনে দু-দু-বার ন্যাশনাল লটারির সর্বোচ্চ প্রাইজ পাওয়ার সৌভাগ্য কজনের হয়। মীগরেঁ এক ছপ্পর-ফোঁড় ললাট-লিখন নিয়ে জন্মেছিলেন। তিনি এখন আমস্টার্ডামের এক ধনকুবের।
মীগরেঁ তাঁর টেবিলে জেড পাথরের ঢাকনি দেওয়া একটা দুর্লভ চুরুট-বাক্স থেকে তুলে নিলেন একটি হাভানা চুরুট। আগন্তুকদের দিকে ঠেলে দিলেন বাক্সটা। চুরুটা ধরাতে ধরাতে প্রশ্ন করেন, কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমার মতো অকিঞ্চনের কাছে কেন? মহান-শিল্পী ভের্‌মিয়ারের বিষয়ে একাধিক অথরিটি তো আছেন এ শহরে?
— মানছি, স্যার। তাঁদের দোরেও ধরণা দিয়েছি। প্রয়োজনে আবার যাব। ব্যাপারটা কী জানেন স্যার—'ভেরমিয়ার' হচ্ছেন একটি পার্টস্-খোয়া-যাওয়া জিগ্‌স-পাজ্‌ল। কিছুতেই খাঁজে-খাঁজে মেলে না। এককে-জন এক-এক কথা বলছেন। কোনটা সত্য, কোন্‌টা ভ্রান্ত...
— তা ঠিক, 'ভেরমিয়ার' এক মূর্তিমান সমস্যা! সবকিছুই রহস্যঘন। কথা সেটা নয়। আমার প্রশ্ন : আপনারা তো পুলিস? শিল্পী ভেরমিয়ারের পিছনে লেগেছেন কেন? আর তিনি তো প্রায় সাড়ে তিন শ বছর আগেই ফৌৎ হয়েছেন!
ক্যাপ্টেন দুজঁ এতক্ষণে চুরুটের বাক্সটার দিকে নজর দেয়। একটি মহার্ঘ চুরুট তুলে নিয়ে নিপুণ-হাতে ধরাতে ধরাতে বলে, আমরা ঠিক পুলিস নই, মস্যুয়ে মীগেরেঁ। আমরা নেদারল্যান্ডস্-এর এক প্যারা-মিলিটারী ফোর্স এর অফিসার। যুদ্ধান্তে সংগঠিত 'অ্যালায়েড আর্ট কমিশন' এর নির্দেশে পরিচালিত। আমাদের য়ুনিটের সেবা বিশ্ব-ললিতকলার স্বার্থে। আপনি তো জানেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সব কিছু তছনছ হয়ে গেছে। নতুন করে সব আবার গড়তে হবে। ঘর-বাড়ি, চার্চ, ম্যুজিয়াম, আর্ট-গ্যালারি। আমাদের য়ুনিটের কাজ হচ্ছে খোঁজ নিয়ে দেখা—নাৎসী সমরনায়কেরা অধিকৃত ইউরোপের কোন্ কোন্ শিল্পসম্পদ অপহরণ করে নিয়ে গেছিল। সেগুলিকে উদ্ধার করা এবং আইনসঙ্গত মালিককে তা প্রত্যর্পণ করা। ঐ সঙ্গে আমরা খোঁজ করে দেখি, নিজ দেশের জাতীয় সম্পদ কে বা কারা অর্থলোভে ঐ নাৎসী সমরনায়কদের হাতে তুলে দিয়েছে। ব্যক্তিগত মুনাফার লোভে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে। সন্ধান পেলে, প্রমাণ পেলে, আমরা অপরাধীকে দায়রায় সোপর্দ করার চেষ্টা করি। বিচারক বিচারান্তে তার শাস্তিবিধান করেন।
পুনরায় বাধা দিয়ে গৃহস্বামী বলেন, আপনি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন অফিসার! আমি জানতে চাইছি : সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে ঐ বেঁড়ে ব্যাটাকে কেন? হোয়াই ভেরমিয়ার?
— যেহেতু অতি সম্প্রতি আমরা শিল্পী ভেরমিয়ারের একটি অমূল্য তৈলচিত্র উদ্ধার করেছি। অস্ট্রিয়ায়, অল্ট-ঔসী অঞ্চল থেকে। বিশ্বযুদ্ধের আগে ত্রিশের দশকে ছবিটা ছিল হল্যান্ডে। কোনও একজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে। আমরা জানতে চাই—কে ঐ ছবিটার ন্যায্য মালিক? তাঁকে আমরা তৈলচিত্রটি ফেরত দিতে চাই।
— বলেন কি, মশাই? কোটি টাকার সম্পদ উদ্ধার করলেন, অথচ তার দাবীদার নেই?
— কারণ আছে। মালীকানা দাবী করলেই যে তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে — কী ভাবে ছবিটা হল্যান্ড থেকে অস্ট্রিয়ায় চলে গেল! আসল ব্যাপার কী জানেন? আমরা নিঃসন্দেহ : শেষ-মালিক ছবিখানা একজন কুখ্যাত নাৎসী সমরনায়ককে বিক্রি করেছিল।
— আই সী! —ছাইদানীতে চুরুটের ছাইটা ঝেড়ে বলেন, ভেরমিয়ারের কোন ছবিটা বলুন তো?
— Adulteress! পতিতা!
মীগরেঁ জবাব দিলেন না। দু-চোখ বুঁজে হঠাৎ আত্মস্থ হয়ে পড়েন। দুর্জঁর সহকারী দুমার প্রশ্নে ধ্যানভঙ্গ হল তাঁর : ঐ ছবিখানা আপনি দেখেছেন স্যার?
একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল মীগেরেঁর। শান্তস্বরে বললেন, দেখেছি! চিত্রপটে — যতদূর মনে পড়ছে — চারটি চরিত্র। সামনে নতনেত্র ব্যভিচারিণী। তার মাথায় ঘোমটা, মুখে সলজ্জ কিন্তু মোহময়ী হাসির আভাস। যীজাস্ দক্ষিণ হস্তের তর্জনী তুলে ঐ চরিত্রহীনাকে কিছু একটা কথা বলছেন। তাঁর বাঁ-হাত ঐ পতিতার স্কন্ধে। তাঁর নিষ্পাপ মূর্তি করুণাঘন। যীজাস এর দু-পাশে দুজন পুলিস অফিসার। তাদের ভ্রূ-ভঙ্গে মনে হয় তারা বিরক্ত। হয়তো যীজাস্-এর ঐ সান্ত্বনাদানকারী বাম-হস্তের মুদ্রায়। অথবা দক্ষিণ হস্তের তর্জনীতে। ওরা বুঝতে পারছে না—ঐ তর্জনীটি পতিতার দিকে নির্দেশ করছে না, করছে দর্শকের দিকে। তর্জনী বলতে চায়—পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়!
দুর্জঁ জানতে চায়, ঐ তৈলচিত্রটির বর্তমান বাজার-দর কত হতে পারে?
— বর্তমান বাজারদর আন্দাজ করা মুশকিল। যুদ্ধোত্তরকালে এখনও বাজার স্থিরতা লাভ করেনি। এখনো কোন উল্লেখযোগ্য অক্‌শানও হয়নি। যতদূর মনে পড়ছে—ছবিটা ষোল-সতের লক্ষ গিল্ডারে (সে আমলে সাত লক্ষ ডলার, বর্তমান হিসাবে প্রায় এগারো লক্ষ ডলার অর্থাৎ দু কোটি টাকায়) প্রথম বিক্রি হয়।

— ঠিকই বলেছেন আপনি। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি তো আপনার!

মীগরেঁ তৃপ্তির হাসি হাসলেন শুধু।

— শুধু প্রথম বিক্রি কালেই নয় স্যার, যুদ্ধের সময় ঐ দামেই নাৎসী সমরনায়কটি ছবিটা কিনেছিল। ঐ সতের লক্ষ গিল্ডারেই! সেই সমরনায়কটি কে জানেন? বর্তমানে যুদ্ধবন্দী এবং সে-আমলে বিশ্বত্রাস অ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলারের ডান হাত! স্বয়ং ফিল্ড-মার্শাল গোয়েরিঙ!

মীগরেঁ বিড় বিড় করে কী যেন সাপের মন্ত্র আওড়ালেন। বুকে ক্রুশচিহ্নও আঁকলেন—যেন নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানের কাছে নাম করা হয়েছে : শয়তানের! দুঁজ বলে, কে কিনেছিল জানা গেছে, কত দামে কিনেছিল তাও জানা গেছে। শুধু জানি না : কে বেচেছিল! অর্থাৎ নানান হাত-বদলের পর কে ছিল ঐ মহান শিল্পসম্পদের শেষ মালিক। সেটার হদিস্ পেতেই আপনার কাছে আসা। প্রথমে বলুন, ছবিটা আপনি কোথায় দেখেছিলেন—

— কোথায় প্রথম দেখি, সে কথা অ্যাদ্দিন পরে...

— কোথায় প্রথম দেখেন! তার মানে ছবিটা আপনি অনেকবার দেখেছেন?

মীগরেঁ নড়েচড়ে বসেন। বলেন, অফিসার্স! কবে, কোথায়, কতবার দেখেছি তা আমার মনে নেই। মনে থাকার কথাও নয়। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে পুলিসের কাছে জবানবন্দী দিতে হবে সে-কথা তো জানা ছিল না। শিল্পী হিসাবে আমার শুধু মনে আছে—সেটি একটি অনবদ্য ভেরমিয়ার; সার্থক শিল্পসৃষ্টি! শিল্প-ব্যবসায়ী হিসাবে মনে আছে—ওটার দাম প্রায় ষোল লক্ষ গিল্ডার। এর বেশি আমার আর কিছু মনে নেই। আপনারা আমাকে মাপ করবেন। আশা করি আপনাদের ইন্টারভ্যু শেষ হয়েছে?

ক্যাপ্টেন দুঁজ তার সহকারীর দিকে ফিরে বললে, তুমি কী বল? ইন্টারভ্যু শেষ হয়েছে?

লেফটানেন্ট দুমা যথারীতি তার চিবুকটা চুলকে নিয়ে বললে, ছবিটার সম্বন্ধে ওঁর যখন আর কিছু মনেই পড়ছে না তখন আর ওঁকে বিরক্ত করে কী লাভ? তবে-ঐ কী-নাম-যেন? হ্যাঁ, ভেরমিয়ার সম্বন্ধে তোমার যদি কোন জিজ্ঞাসা থাকে...

ক্যাপ্টেন দুজঁ লুফে নিল কথাটা : ঠিক কথা। ভুলেই গেছিলাম! শিল্পী ভেরমিয়ার সম্বন্ধে আমাদের সংক্ষেপে কিছু বলুন। বিশ্বললিতকলায় তাঁর কতগুলি চিত্র স্বীকৃত? শিল্পীর জীবিতকালে সেগুলির কী রকম দাম ছিল, ইত্যাদি—

মীগরেঁ আবার স্বাভাবিক হলেন মনে হল। বোধ করি ঐ 'পতিতা'র আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে। বলেন, সে-বিষয়ে আপনাদের যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করতে পারি বটে। শুনুন :

ভেরমিয়ার ওলন্দাজ শিল্পী (1632-75)। জন্ম দেল্‌ফ্‌ৎ-এ। মারা যান তেতাল্লিশ বছর বয়সে। তাঁর সম্বন্ধে সঠিকভাবে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। এটুকু শুধু জানা যায়—জীবিতকালে তিনি আদৌ স্বীকৃতি পাননি। মৃত্যুর পরে তাঁর হেপাজতে খান-বিশেক ছবি পাওয়া যায়। সবই 'জেনরি পিক্‌চার' — মানে, মধ্যবিত্ত ডাচ্ গৃহস্থালির ঘরোয়া ছবি। মুদির কাছে, কসাইখানায়, বাড়িওয়ালার কাছে, যে ঋণের বোঝা তিনি রেখে গেছিলেন তাই মেটাতে সরকারের তরফ থেকে ছবিগুলি নিলামে বিক্রয় করা হয়। জলের দামে রাম-শ্যাম-যদু তা কিনে নেয়। কে বা কারা কিনেছিল তার না আছে হদিস্, না হিসাব। জনশ্রুতি—শুঁড়িখানার মালিকের পাওনা মেটাতে যখন সরকারী নিলামদার একখানি ভেরমিয়ার তুলে দিলেন তখন লোকটা সর্বসমক্ষে ক্যানভাসটা ফাঁসিয়ে দেয়। বলে, যা গেছে তা তো গেছেই—তার উপর এই নোংরা ছবিখানা



ঘরে টাঙিয়ে রাখার যন্ত্রণা আমার সইবে না। বলা বাহুল্য, ছবিখানা নষ্ট না করলে সে সারাজীবন মদ বেচে যা উপার্জন করেছে, তার দশ-বিশ হাজার গুণ অর্থ পেত লোকটার ওয়ারিশবর্গ! তা সে যাই হোক, ভেরমিয়ারের মৃত্যুর পর দশ বছর ধরে তাঁর নানান ছবি বারে বারে বেনামে বিক্রি হয়েছে, অতি অল্প মূল্যে—

— 'বেনামে'! কেন, বেনামে কেন?

— ছবির মালিক ভেরমিয়ারের স্বাক্ষরটা ঘষে তুলে ফেলেছে। বলতে চেয়েছে এ ছবি তার্বোর্গ, দি হু অথবা মেঈরির আঁকা!

— ওরাঁ কারা?

— ভেরমিয়ারের সমকালীন ডাচ্ চিত্রশিল্পী। আর্ট স্কুলের ছাত্র ছাড়া যাঁদের নাম আজকের দিনে কেউ জানে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন আর্টডীলারের দিনপঞ্জিকার একটি বেদনাবহ অংশ এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। হতভাগ্য চিত্রব্যবসায়ী তার ডায়েরিতে লিখছে—"আজ জানতে পারলাম, ও-মাসে দি-হুর যে জেন্‌রি-পিক্‌চারখানা খরিদ করেছি সেটা নকল! আসল চিত্রকর কে-এক হতভাগ্য ভেরমিয়ার! মৃত্যুর পর তার স্থাবর-অস্থাবর যখন নিলাম হয় তখন এই ছবিটা কেউ কিনে নেয়, আর কায়দা করে সেই অখ্যাত ভেরমিয়ারের স্বাক্ষরটা চাপা দিয়ে দি হুর সইটা জাল করেছে! একমুঠো গিল্ডার জলে গেল, তার মানে।"

এভাবেই দীর্ঘদিন অখ্যাত অবজ্ঞাত হয়ে পড়েছিলেন ভেরমিয়ার। তারপর চাকা ঘুরে গেল! ভেরমিয়ারের 'রেজারেক্‌শান' হল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি! একজন ফরাসী গবেষক 'বুর্গে' ছদ্মনামে প্রমাণ করতে চাইলেন—ভেরমিয়ার একজন অসামান্য চিত্রকর। অধিকাংশই অবশ্য সেকথায় কান দেয়নি। এ ঘটনা গত শতাব্দীর ষাটের দশকে। 'বুর্গের' গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার ষোল বছর পরেও দেখছি, 1882 সালে পাব্‌লিক্ অ্যক্‌শানে ভেরমিয়ারের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র মাত্র পাঁচশিলিঙ-এ বিক্রি হয়েছে! ছবিটার নাম : Girl with Pearl Eardrops (মুক্তাকর্ণাভরণশোভিতা)। আজকে তার বাজার-দর কয়েক কোটি গিল্ডার্স। বর্তমান বিশেষজ্ঞদের মতে ভেরমিয়ারের খান-বিশেক ছবি অরিজিনাল।* বাদ বাকি নকল—ওঁর নামে চলে। ভেরমিয়ার সম্বন্ধে আর কি জানতে চান বলুন?

দুজঁ একই কায়দায় সহকর্মীকে প্রশ্নটা চালান করে দেয় : আর কিছু জানতে চাও?

দুমাও যথারীতি চিবুকে হাত বুলিয়ে জবাব দেয়. নাঃ। তবে ঐ যে তোমার কী একটা সমস্যাটা আছে..ঐ যে আর্ট-হিস্ট্রির কেতাবে তুমি সেদিন কী যেন দেখলে...

—ও, হ্যাঁ। —যেন কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে দুজঁর। বললে, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। সেদিন আর্ট-হিস্ট্রির একটা কেতাবে দেখলাম লেখা আছে, ভেরমিয়ারের ঐ 'অ্যাডালটারেস্' ছবিখানা আপনার সংগ্রহশালায় এককালে ছিল। আপনি সেটা কাকে যেন বেচেছেন। তাই নয়?

---

*ফাইডন-প্রকাশনায় 1967 সালে বলা হয়েছে, সাঁইত্রিশখানি ছবি ভেরমিয়ারের নামে চলে, তার ভিতর ত্রিশটি নিঃসন্দেহে অরিজিনাল। অপরপক্ষে 'টাইম-বুক' প্রকাশিত গ্রন্থে ঐ বছরই বিশেষজ্ঞ বলেছেন ষোলখানি ছবি সন্দেহাতীত ভাবে ভেরমিয়ারের। বাকীটা জাল। বলা বাহুল্য—প্রতিটি চিত্রের মূল্য কয়েক কোটি টাকা।

মীগরেঁ নিমীলিত নয়নে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন, হতে পারে। অসম্ভব নয়। খাতাপত্র ঘাঁটলে বলতে পারব। কেন বলুন তো?

— ব্যাপারটা কী জানেন? আমরা দু-দুজন চিত্র-ব্যবসায়ীর সন্ধান পেয়েছি, যাঁদের হেপাজতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে ঐ 'অ্যাডালটারেস্' ছবিখানা ছিল। কার কাছে আগে, কার কাছে পরে তা সঠিক জানা যায়নি। দুজনেই বলেছেন, বোমাবর্ষণে তাঁদের খাতাপত্র সব পুড়ে ছাই হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, ঐ দুজনের মধ্যে একজন—যাঁর কাছে ছবিখানা 'পরে' ছিল, সেই সেটা গোয়েরিঙকে বিক্রি করে দেয়। আমরা দুজনেরই জবানবন্দি নিয়েছি। দুজনে একই কথা বলছেন। ক-বাবু বলছেন যে, তিনি আপনার কাছ থেকে ছবিখানা কেনেন এবং খ-বাবুকে বিক্রি করে দেন। আর খ-বাবু বলছেন যে, তিনি আপনার কাছ থেকে ছবিখানা কেনেন আর ক-বাবুকে বেচে দেন। সুতরাং বুঝতেই পারছেন : আপনিই আমাদের একমাত্র সমাধান! তাই আমরা আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি। না কি বল দুমা?

— হক কথা! ন্যায্য কথা! তাই আমরা এসেছি আপনার সাহায্য চাইতে। এবার আপনি বলুন স্যার। আপনি ছবিটা কাকে বিক্রি করেছিলেন —ক-বাবু, না খ-বাবু?

মীগরেঁ নিমীলিত নেত্রে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। বললেন, আর্টহিস্ট্রিতে যদি লেখা থাকে তবে আমার হেফাজতে নিশ্চয়ই ছিল ছবিটা কোন না কোন সময়ে—

— এবং অত দামী ছবির কেনা-বেচার কথা নিশ্চয় লেখা আছে আপনার হিসাবের খাতায়?

— তা তো থাকারই কথা, যদি না...

— যদি না যুদ্ধকালে আপনার বাড়িতে বোমা পড়ে থাকে। তা কিন্তু পড়েনি!

লোকটার এই আগ্‌বাড়ানো মন্তব্যে মীগরেঁ বিরক্ত হয়েছেন মনে হল। গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনারা কাল সকালে এই সময়ে আসবেন। আমি খাতাপত্র দেখে রাখব। কোথাও না কোথাও নিশ্চয় লেখা আছে—

— মাপ করবেন মস্যুয়ে মীগরেঁ। খবরটা আমাদের আজকেই জানতে হবে। চলুন—কোথায় আপনার খাতাপত্র রাখা আছে, খুঁজবেন চলুন। খোঁজাখুঁজিটা আমাদের উপস্থিতিতে হওয়াই ভাল।

— তার মানে? কী বলতে চাইছেন আপনি?

— সহজ সরল ভাষায়—দেরী না করে উঠুন! এখুনি!

গর্জে ওঠেন মীগরেঁ : কার সঙ্গে কথা বলছেন সেটা খেয়াল রাখবেন মস্যুয়ে অফিসার! আপনাদের পুলিস কমিশনার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু! আমার ক্লায়েন্ট! তা জানেন?

— জানি, সব জানি। শুধু জানি না—ছবিটা কাকে বেচেছিলেন! উঁ? ক-বাবু না খ-বাবু?

— সে কথা আমি আগেই বলেছি। আপনি কি কালা? আমার মনে নেই। খাতাপত্র না দেখে—

— রাইট! খাতাপত্র দেখবেন চলুন। উঠুন! এখনই! রাতারাতি কোন হাতসাফাই যেন না হয়!

— শাটাপ্! আপনার বিরুদ্ধে আমি মানহানির মামলা আনতে পারি, তা জানেন? কী ভেবেছেন আপনি? ডি-ভেলডিকে বলে আপনাকে...



দুজঁ যেন পূজা-প্যান্ডেলের কেটে যাওয়া গ্রামোফোনের ডিস্ক। একই সুরে, একই মেজাজে বেজে চলে : কাকে বেচেছিলেন বলুন তো? উঁ? ক-বাবু না খ-বাবু?

মীগরেঁ অনেকক্ষণ জবাব দিলেন না। ক্লান্ত বোধ করছেন বৃদ্ধ। পূজা-প্যান্ডেলে কি কেউ নেই যে ঐ যন্ত্রটাকে থামিয়ে দেয়? তারপর সবটা আক্রোশ গিয়ে পড়ল ইলেকট্রিক কলিং-বেলটার উপর। আর্তনাদ করে উঠল সেটা। হুড়মুড় করে ছুটে এল খিদমৎগার। মীগেরেঁ বলেন, সেক্রেটারি সাব কো বোলাও।

'বোলাতে' হল না। একান্তসচিবও ছুটে এসেছে কলিং-বেলের আর্তনাদ শুনে। — আমার দশ বছরের খাতাপত্র এই এঁদের সামনে এনে দাও। ওঁরা একটা সেল-ডীড খুঁজে দেখবেন। তুমি সর্বক্ষণ পাহারা দিও—দেখ, এঁরা যেন রাতারাতি কোন হাতসাফাই না করতে পারেন।

একান্ত-সচিব স্তম্ভিত! পুলিশ-অফিসার হাত সাফাই করবে!

দুজঁর কোনও ভাবান্তর নেই। বললে, মাপ করবেন মস্যুয়ে মীগরেঁ। আপনি যে স্ট্যান্ডটা নিচ্ছেন সেটা অবিশ্বাস্য! আপনার নিজেরই স্বীকৃতিমতে গোটা দুনিয়ার ভেরমিয়ারের আঁকা ছবি আছে মাত্র খান বিশ-পঁচিশ। তার ভিতর একখানা—যার বাজার দর আপনার স্বীকৃতিমতে ষোল লক্ষ গিল্ডার— তা যদি দৈবক্রমে আপনার এক্তিয়ারে এসে থাকে এবং আপনি যদি সেটা দশ-বিশ লক্ষ গিল্ডার্সে কাউকে বেচে থাকেন তাহলে ঘটনাটা আপনি ভুলে যেতে পারেন না। অন্তত ক্রেতার নামটা আপনার মনে থাকবেই। সুতরাং বলে দিন—ক-বাবু, না খ-বাবু?

মীগরেঁ আবার গর্জে ওঠেন, আজ্ঞে না মশাই! আমি টম-ডিক-হ্যারি নই! বুঝেছেন? আমি একাধিক ভেরমিয়ার বেঁচেছি! আমি ..

— জানি স্যার! 'ক্রাইস্ট অ্যাট ইম্মায়ুস' বেচে দিয়েছিলেন ডক্টর বুনকে, পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার গিল্ডার্সে; ইন্টিরিয়ার উইথ্ ড্রিঙ্কার্স বেচেছেন ঐ ডক্টর বুনকেই। দু লক্ষ বাইশ হাজারে। 'ইন্টিরিয়ার উইথ্ কার্ড প্লেয়ার্স' ঐ একই দামে। 'লাস্ট সাপার'খানা বিক্রি করেছিলেন সর্বোচ্চ মূল্যে : ষোল লক্ষ গিল্ডার্সে! কেমন? হয়তো আরও ভেরমিয়ার কেনা-বেচা করেছেন আপনি। আমার ঠিক জানা নেই। সে সব হিসাবে আমার কোন কৌতূহলও নেই। আমার শুধু একটি মাত্র প্রশ্ন : 'অ্যাডালটারেস্' ছবিখানা আপনি কোন ভাগ্যবানকে বিক্রয় করেছিলেন? কবে, কত দামে, সে-সব কথাও জানতে চাইছি না আমি — ফলে আপনাকে ইনকাম ট্যাক্স ফাইলও ঘাঁটতে হবে না। আমার প্রশ্ন শুধু একটি মাত্র! এবার বলুন মস্যুয়ে মীগেরেঁ—কাকে? উঁ? ক-বাবু, না খ-বাবু?

মীগেরেঁ তাঁর ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলেন গদি-আঁটা চেয়ারে।

বেলা দশটা।

কাউন্ট আর কন্টাসিনা আর্ট-গ্যালারি দেখে ফিরে গেছেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকা সত্ত্বেও আর্ট-ডীলারের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়নি! তিনি নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়নি। মীগেরেঁর গ্লাসটপ্ টেবিলে তিন কাপ কফি জুড়িয়ে ঠাণ্ডা। কেউ একটি সিপ্ও দেয়নি।

— এবার বলুন মস্যুয়ে মীগরেঁ। কাকে? উঁ? ক-বাবু না খ-বাবু?

— জানি না, জানি না! আমার মনে নেই! আমাকে নিষ্কৃতি দিন আপনারা। ইচ্ছে হয় আমার

খাতাপত্র সার্চ করে দেখুন।
— আপনি জানেন, জানেন এবং জানেন! খাতাপত্র ঘেঁটে লাভ নেই। শুধু মুখে বলুন—কাকে ? ঐ 'অ্যাডালটারেস'খানা ? উঁ? ক-বাবু, না খ-বাবু ?
— ওরা দুজনেই মিথ্যেবাদী!
— কারা ?
— ঐ হোফার আর স্ত্রিভেসান্দে!
— তারা কারা ?
— ড্যাম ইট! ন্যাকা সাজছেন! ঐ আপনার ক-বাবু আর খ-বাবু!
— তবেই দেখুন! সব কিছুই আপনার মনে আছে। আপনার স্বীকৃতি-মতে 'ক-বাবু' হয়ে গেলেন ডক্টর ওয়াল্টর হোফার, আর 'খ-বাবু' স্ত্রিভেসান্দে! দুজনেই হল্যান্ডের নামকরা আর্ট-ডীলার। এবার বলে দিন—ছবিটা কার কাছে কিনেছিলেন আর কাকে বেচে দিয়েছিলেন ? উঁ? হোফার না স্ত্রিভেসান্দে ?
— জানি না! আমার মনে নেই। বিশ্বাস করুন।
— লুক হিয়ার মস্যুয়ে মীগেরেঁ। আমরা নিঃসন্দেহ যে, ছবিটা আপনি নিজে গোয়েরিঙকে বিক্রি করেননি। করতে পারেন না। কারণ গোয়েরিঙ যখন অকুপায়েড হল্যান্ডে আসে, এই ছবিগুলো খরিদ করে, তখন আপনি দক্ষিণ ফ্রান্সে। বজ্র-বাঁধুনি অ্যালেবাঈ! সুতরাং শত্রুপক্ষকে ছবিখানা বেচে দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আপনার বিরুদ্ধে আমাদের কোন চার্জ নেই। কিন্তু আপনি যে স্ট্যান্ড নিচ্ছেন তাতে অপরাধীর সহায়ক হিসাবে — অপরাধীকে বাঁচাবার চেষ্টার অপরাধে— হয়তো আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হব—
— করুন! তাই করুন! যান, থানায় ফিরে যান। আমার বডি-ওয়ারেন্ট বার করে আনুন!
দুর্জঁ জবাব দিল না। সহকারীর দিকে ফিরে কী যেন ইঙ্গিত করে।
লেফ্‌টানেন্ট দুমা নিঃশব্দে বুকপকেট থেকে একখণ্ড হলদে রঙের কাগজ বের করল। ভাঁজ খুলে গ্লাসটপ্ টেবিলে বিছিয়ে পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা দিল।
আঁরিকুস্ আন্তেনিউস্ ভাঁ মীগেরেঁর নামে বিধিবদ্ধ বডি-ওয়ারেন্ট!
মীগেরেঁ নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত দুটি বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, পরান! হাতকড়া পরান!
দুর্জঁ ধীরেসুস্থে গ্রেপ্তারি পরওয়ানাখানা তুলে বুকপকেটে রেখে দেয়, অনুত্তেজিতকণ্ঠে বলে, এটা আমার শেষ অস্ত্র। আপনি যদি হোফার অথবা স্ত্রিভেসান্দেকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর হন! কিন্তু এটা প্রয়োগ করার কোন প্রয়োজনই আমার হবে না— তাই নয় ? আপনি কেন অপরাধীকে বাঁচাতে চাইবেন ? আপনার স্বার্থ কী ? আপনি তো দুষ্টচক্রের ভিতরে ছিলেন না কোনদিন ? তাহলে ? এবার বলে দিন—প্লীজ! হোফার না স্ত্রিভেসান্দে ? উঁ?
— আমার মনে নেই।

পরদিন। সকাল দশটা।
চব্বিশ ঘণ্টা নাগাড়ে ইন্টারোগেশান চলেছে। ঐ চেয়ারে বসেই স্যান্ডুইচ চিবিয়েছে ঐ দুজন পুলিস অফিসার আর মীগেরেঁ। সারারাত কেউ দু-চোখের পাতা এক করেনি। মীগেরেঁর পায়ের কাছে পার্শিয়ান কার্পেটে গোটা তিনেক ফুটো হয়েছে। জ্বলন্ত সিগারের স্টাম্প অ্যাশট্রের বদলে



কার্পেটে ফেলে পা দিয়ে পিষেছেন বলে। টেবিলের উপর তিনটে খালি বোতল। মীগেরেঁ এই চব্বিশ ঘণ্টায় যতবার ইউরিন্যালে গেছেন দুমা গেছে পিছন পিছন। একান্তসচিব প্রথম দিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করার পূর্বে অনুমতি নিতে আসছিল। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করার পর সে নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মতোই আগন্তুকদের ঠেকাচ্ছে। ও-ঘর থেকে টেলিফোন করেও কোন যোগাযোগ করতে পারেনি। কারণ এ-ঘরে টেলিফোন রিসিভারে নেই। গ্লাসটপ টেবিলে নামানো। একান্ত-সচিব নিজেও সারারাত ঘুমোয়নি। ঘুমায়নি ভ্যালেটও। ও ঘরে দুজন জেগে বসে আছে। এ কী কাণ্ড হচ্ছে পাশের ঘরে ? ওরা জানে না। মালিককে শেষবার দেখেছে গতকাল রাত আটটায়। যখন মালিকের ব্যক্তিগত চিকিৎসক এসে ওঁকে পরীক্ষা করেন। ঔষধ দেন। পুলিস অফিসারের উপস্থিতিতেই। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, প্লীজ অফিসার্স! এবার আমার পেশেন্টকে ঘুমাতে দিন।
— দেব! উনি একটিমাত্র প্রশ্নের জবাব দিলেই। শব্দটা উচ্চারণ করতে ওঁর...
হঠাৎ সহকর্মীর দিকে ফিরে প্রশ্ন করে : কতটা সময় লাগতে পারে দুমা ?
লেফ্‌টানেন্ট দুমা চিবুকে হাত বুলাতে বুলাতে বলে, সাড়ে তিন থেকে চার সেকেন্ড!
ডাক্তারবাবু আগ্ বাড়িয়ে বলেছিলেন, বুঝেছি! কিন্তু সেই স্বীকারোক্তি...
— আজ্ঞে না, ডক্টর! বোঝেননি! আপনি যা ভাবছেন তা নয়! ঐ একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণে ওঁর নিজের কোন বিপদ নেই। পুলিস কমিশনার লিখিত গ্যারেন্টি দিতে স্বীকৃত—ঐ স্বীকারোক্তি বলে মস্যুয় মীগেরেঁকে কোনদিন কোন আদালতে অভিযুক্ত করা হবে না। আমরা লিখিত স্বীকারোক্তি চাইছিও না। চাইছি একটা খবর—যা উনি জানেন, অথচ বলছেন না। আপনার পেশেন্ট স্বেচ্ছায় এই যন্ত্রণাভোগ করছেন! আত্মনির্যাতন! এবার বলুন মস্যুয়ে মীগেরেঁ! আমাদেরও ঘুম পাচ্ছে! বলুন : টুইডল্‌ডাম্ না টুইডল্‌ডী ? উঁ?

ঐদিন সন্ধ্যা ছয়টা!
— বলুন মস্যুয়ে মীগেরেঁ। অরিজিনাল ভেরমিয়ারখানা ...
হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন বৃদ্ধ! মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে তাঁর। সহ্যের শেষ সীমান্ত অতিক্রান্ত হয়েছে এতক্ষণে। চীৎকার করে উঠলেন : য়ু ফূলস্! য়ু ঈডিয়ট্‌স্! শোন্ গণ্ডমূর্খের দল! আমি জীবনে কোন অরিজিনাল ভেরমিয়ার কিনিনি, বেচিনি! বুঝলি ? ...ঐ 'পতিতা'খানা, ঐ 'অ্যাডেলটারেস্'খানা ফেক্! নকল! ওটা...ওটা আমি এঁকেছি! ভেরমিয়ার অব ডেলফ্‌ৎ নয়! আঁরিকুস্ অ্যান্তেনিউস্ ভাঁ মীগেরেঁ! কিছু ঢুকল তোদের মোটা-মাথায় ? ভেরমিয়ার তিনশ বছর আগে মরেনি! এতদিনে তার রেজারেক্‌শান হয়েছে! এ প্রজন্মে তার নাম হান মীগেরেঁ! কিছু বুঝলি ?
আরও ঘণ্টাখানেক পরে।
পুলিস-ডাক্তার মীগেরেঁকে পরীক্ষা করে বললেন, ইন্টারোগেশনের প্রচণ্ড মানসিক চাপে ওঁর নার্ভাস ব্রেক-ডাউন হয়েছে। উনি এখন ডিলিরিয়াম বকছেন! ওঁর ঘুম হওয়া দরকার!
— ও.কে.! ইনজেক্‌শান দিয়ে ঘুম পাড়ান—দুর্জঁ উঠে দাঁড়ায়।
স্ট্রেচার-বিয়ারার দল ঘরে ঢুকল।
অর্ধোন্মাদ হান ভাঁ মীগেরেঁকে ওরা পুলিসের অ্যাম্বুলেন্স ভ্যানে তুলে নিয়ে গেল। আইনানুগ

একান্ত সচিবকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাখানা সার্ভ করে।

না, মীগেরেঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। পুলিস নিঃসন্দেহ— মীগরেঁ ঐ ছবিখানা গোয়েরিঙকে বিক্রয় করেননি। গোয়েরিঙ-এর সঙ্গে মীগেরেঁর কোন যোগাযোগ হয়নি, হওয়া সম্ভবপর নয়! কে বা কারা ছবিখানা গোয়েরিঙকে বেচে দিয়েছিল তা জানা যাচ্ছে না। কিন্তু পুলিস নিঃসন্দেহ, সেই লেনদেনে মীগেরেঁর কোন ভূমিকা নেই। এখন সে ডিলিরিয়ামে আবোল-তাবোল বকছে বটে—কিন্তু এটা সন্দেহাতীত যে, মীগেরেঁ অপরাধীকে বাঁচাতে চায়।

কাকে? হোফার না স্ত্রিভেসান্দে?

তার চেয়েও বড় কথা : কেন?

ওঁকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া পুলিসের গত্যন্তর ছিল না!

## ॥ দুই ॥

স্থান: নাৎসী-বাহিনীর হাত থেকে সদ্য-মুক্ত পারী নগরীর কেন্দ্রস্থলে 'ফিগারো' দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের দপ্তর—অর্থাৎ ফরাসী-ভাষায় সব-বিখ্যাত সংবাদপত্র দপ্তরের কেন্দ্রবিন্দু।

কাল: 1.7.1945—অর্থাৎ মীগেরেঁর গ্রেপ্তারের মাসখানেক পরের কথা।

পাত্র : পাত্র নয়, পাত্রী: মাদাম অ্যাগনেস্ শ্যাম্পেন—অর্থাৎ ফিগারো-পত্রিকার সহকারী আর্ট ডিরেকটার।

সম্পাদক ডক্টর নিকোলাস লে লোরেনের বয়স যে সত্তর পেরিয়েছে সেটা তাঁকে দেখলে সহজে বোঝা যায় না। চুলগুলি অবশ্য ধব্‌ধপে সাদা—সেটাও সাম্প্রতিককালের, হয়েছে সদ্যসমাপ্ত বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে। চামড়াতেও দেখা দিয়েছে কুঞ্চনরেখা—প্রাচীন তৈলচিত্রের উপর যেন মহাকালের ঊর্ণনাভ-আলিম্পন রেখা। কিন্তু এখনো তাঁর মেরুদণ্ড সোজা। কালযুদ্ধ পাড়ি দিয়ে ফিগারো যে সসম্মানে কী করে টিকে আছে তা ওঁকে দেখলে বোঝা যায়। অসাধারণ ব্যক্তিত্বময় পুরুষ।

আর্ট-ডিরেক্টার ডক্টর সালভাতোর বার্নিনী দু-পুরুষ পূর্বে ছিলেন ইতালিয়ান। এখন উনি ফরাসী নাগরিক। বিশ্ব-ললিতকলার যাবতীয় তথ্য তাঁর নখদর্পণে। মাদাম অ্যাগনেস্ শ্যাম্পেন বিগতভর্তা। বয়স ত্রিশ। স্বামী ডক্টর শ্যাম্পেন প্রাণ দিয়েছেন পারীর রাস্তার-লড়াইয়ে, নাৎসী বুলেটে। মাদাম এখন একাই থাকেন পারীর শহরতলীতে, একটি এক-কামরার অ্যাপার্টমেণ্টে। আধুনিক ডাচ-পেইণ্টার্সদের বিষয়ে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছিলেন। থিসিস্ শেষ হবার আগেই বেধে গেল বিশ্বযুদ্ধ। বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছিল সাংবাদিকতার চাকরি। ফিগারো পত্রিকায় রবিবাসরীয়তে একটি স্তম্ভ লিখে নাম করেছেন। ললিতকলার সমালোচনা।

রাত সাতটা। যুদ্ধবিধ্বস্ত পারী তার গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে ফিরে পেতে চাইছে। প্রতিদিনই রাস্তার এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে সংযোজিত হচ্ছে নতুন সাইন-বোর্ড, নতুন নিয়ন আলোর ঝল্‌কানি। সম্পাদকের ঘরে কিন্তু স্তিমিত আলোক। বোধকরি খাতাকলমে ব্ল্যাক-আউটের অবসান ঘটলেও এঁরা এখনো জোরালো আলোয় অভ্যস্ত হতে পরেননি।

লোরেন বললেন, যে-কথা বলছিলাম—হান্ ভাঁ মীগেরেঁর উপর একটি সমীক্ষা করতে চাই আমি। তোমরা কাকে দায়িত্ব দিতে চাও বল?



বার্নিনী বললেন, আপনি কিন্তু স্যার এখনো আমার প্রশ্নটির জবাব দেননি। ভাঁ মীগেরেঁকে কেন এতটা গুরুত্ব দিতে চাইছেন?

— শোন! একথা কেউই অস্বীকার করবে না যে, যুদ্ধকালে নাৎসী সমরনায়কেরা—ঐ গোয়েরিঙ্ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গের দল—অধিকৃত য়ুরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু বহু শিল্পসম্পদ নিজেদের দেশে পাচার করেছে। আমরা যদি অবিলম্বে তৎপর না হই তা হলে সেগুলি নষ্ট করে ফেলা হতে পারে। আমার ধারণা—হোফার-স্ত্রিভেসান্দে-মীগেরেঁ চক্র ছিল নেদারল্যান্ডস্ এ এই কালো-বাজারের মূলকেন্দ্র। রাইখ্‌স্ মুজিয়ামের ইন্‌ভেন্ট্রিও যুদ্ধোত্তরকালে করা হয়নি! অর্থাৎ আমস্টার্ডামের সেই বিশ্ববন্দিত আর্ট-মুজিয়ামে প্রাক্‌যুদ্ধকালে যেসব ছবি ছিল তার কতগুলি খোয়া গেছে তা পর্যন্ত আমরা জানি না। কে জানে—রেম্‌ব্রাণ্ট কিম্বা বত্তিচেল্লির কোনও মাস্টারপীস্‌ও ওরা ঐভাবে বেচে দিয়েছে কিনা—

— কিন্তু 'অ্যালায়েড-আর্ট' কমিশানের নির্দেশে নেদারল্যান্ড-পুলিস তো সেটাই তদন্ত করে দেখছে! 'অ্যাডালটারেস্' ছবিখানার ব্যাপারে মাসখানেক আগে ভাঁ মীগেরেঁকে গ্রেপ্তারও করেছে—

— তুমি বুঝতে পারছ না, বার্নিনী। প্রথম কথা অ্যালায়েড-আর্টকমিশন-এর আর্মি-অফিসারগুলো মাথা-মোটা! আমি ওদের 'সাজেস্ট' করলাম—ওরা ঘোষণা করুক যে, চোরাই মাল যার হেপাজতে আবিষ্কৃত হবে তাকে অভিযুক্ত করা হবে না, বরং পুরস্কৃত করা হবে। ওরা রাজী হল না! ওদের মতে যে ছবিটা কিনেছে এবং যে বেচেছে তারা দুজনেই সমান অপরাধী। সুতরাং যার হেপাজত থেকে অমন ছবি খুঁজে বার করা হবে তাকেও অভিযুক্ত করা যাবে, যদি না সে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারে।

অ্যাগনেস্ আগ্‌বাড়িয়ে বলে, কিন্তু সেটাই তো হওয়া উচিত, স্যার? দেশের আইন এবং এথিক্স-এর নির্দেশে। তাই নয়?

বৃদ্ধ অসহায়ের ভঙ্গিতে শ্রাগ্ করলেন। বলেন, তোমরা সবাই সমান! সোজা কথাটা সহজভাবে বুঝবে না! ফৌজদারী আইন আর মনগড়া 'এথিক্স'-এর গোলকধাঁধায় পাক খাবে! শোন বলি! ধরা যাক পারী যখন নাৎসী অধিকারে ছিল তোমার সঙ্গে একটি জার্মান সোলজারের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, কিম্বা সে তোমার প্রতিবেশী ছিল। অ্যালায়েড-আর্মি শহরে প্রবেশ করছে শুনে সে রাতারাতি জার্মানিতে পালিয়ে গেল। আর যাবার সময় তোমার কাছে একটি ক্রেটবন্দী ছবি গচ্ছিত রেখে গেল। ধরা যাক, যুদ্ধ শেষে এখন তুমি ক্রেট খুলে দেখছ সেটা দ্য ভিঞ্চির মোনালিসা অথবা রেমব্রাণ্টের 'নাইট ওয়াচ'! যে গচ্ছিৎ রেখেছিল সে তো মরে ভূত হয়েছে। তুমি তাহলে এখন কী করবে?

এমন একটা অদ্ভুত প্রশ্নের কী জবাব দেবে অ্যাগনেস্ বুঝে উঠতে পারে না।

লোরেন নিজে থেকেই বলেন, তুমি অনেক কিছু করতে পার। পুলিসে খবর দিতে পার, চোরাবাজারে জলের দরে ছবিখানা বেচে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে পার, এমনকি আতঙ্কের তুঙ্গশীর্ষে উঠে রুদ্ধদ্বারকক্ষে ছবিখানা পুড়িয়েও ফেলতে পার!

অ্যাগনেস্ চাপা আর্তনাদ করে ওঠে: পুড়িয়ে ফেলব? 'মোনালিসা' অথবা 'নাইট ওয়াচ'!

বৃদ্ধ ধমকে ওঠেন, আহা-হা! পার্সোনালি নিচ্ছ কেন কথাটা? তুমি তো এখানে মস্যুয়ে এক্স কিম্বা মাদমোয়াজেল ওয়াই! যদি তুমি ছবিটা চোরাবাজারে বেচে দাও তাহলে তা উদ্ধার করা

আরও কঠিন হয়ে পড়বে। চোরা-বাজারের অন্ধগলিতেই ক্রমাগত পাক খেতে থাকবে সেটা! পুড়িয়ে ফেল্‌লে বিশ্বললিতকলার মহাসর্বনাশ! আর সুবুদ্ধির পরিচয় দিতে যদি পুলিসের দ্বারস্থ হও তাহলে 'বাঘ ছুঁলে আঠেরো ঘা'! এজাহার দিতে দিতে প্রাণান্ত! তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, ঐ ছবিটি অপহরণের ব্যাপারে তোমার কোনও ভূমিকা ছিল না। পুলিস তোমার এ-কথা যদি বিশ্বাস না করে, মনে করে-এর মধ্যে তোমারও লভ্যাংশ আছে, তাহলে তোমার খাতাপত্র, ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স, সেফ্‌-ডিপজিট লকার, ইনকামট্যাক্স-ফাইল ঘাঁটতে বসবে। নয় কি?

বার্নিনী আলোচনাটাকে পুনরায় সঠিক পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন, বেশ, বুঝলাম, আপনি 'অ্যালায়েড-আর্ট-কমিশনে'র উপর আস্থা রাখতে পারছেন না। কিন্তু একটি সংবাদপত্রের পক্ষে এতবড় ব্যাপারে—

সোজা হয়ে বসলেন লোরেন। বললেন, ভুল বল্‌লে ডক্টর বার্নিনী। আমরা সংবাদপত্রের কথা আলোচনা করছি না। আমরা 'ফিগারো'র কর্মপন্থা নির্ধারণ করছি। ফিগারো 'একটি' সংবাদপত্র নয়—ফিগারো হচ্ছে, ফিগারো।

ডক্টর বার্নিনী বলেন, বেশ, মানলাম! সে-ক্ষেত্রে আপনি আমাকে অথবা অ্যাগনেস্‌কে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? এ কাজ তো গোয়েন্দার। কলা-সমালোচকের নয়। আপনার অধীনে অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক আছে যারা দক্ষতার সঙ্গে—

—না! কাজটা শুধু গোয়েন্দার নয়। আধা-গোয়েন্দার আধা-শিল্প-বিশারদের। আমি একটি ডাব্‌ল-য়ুনিট টীম তৈরী করতে চাই অধিবৃত্তের আকারে। অর্থাৎ তার দুটি 'ফোসাই'—একজন গোয়েন্দা সাংবাদিক এবং একজন শিল্পকলা-বিশারদ। এরা একে অপরের পরিপূরক। শেষোক্ত মেম্বার হবে অ্যাগনেস্‌। এ বিষয়ে তোমার কী বক্তব্য বার্নিনী?

বার্নিনী বলেন, সে ক্ষেত্রে আমি বলব, আপনার নির্বাচন যুক্তিযুক্ত হয়েছে। অ্যাগনেস্‌ ডাচ্‌-শিল্প বিষয়েই গবেষণা করছিল। ও বোধহয় হান ভাঁ মীগেরেঁর উপরেও কিছু গবেষণা করেছে। তাই নয় অ্যাগনেস্‌?

অ্যাগনেস্‌ গ্রীবাসঞ্চালনে সম্মতি জানায়।

বৃদ্ধ সম্পাদক একটি সিগার ধরিয়ে বলেন, তুমি আমাকে সংক্ষেপে বল তো অ্যাগনেস্‌, হান মীগেরেঁর ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী?

অ্যাগনেস্‌ একটু নড়ে-চড়ে বসে। বক্তব্যটা গুছিয়ে নিয়ে বলতে থাকে— আধুনিক ডাচ শিল্পে হান ভাঁ মীগেরেঁ এমন কিছু উল্লেখযোগ্য শিল্পী নন। জীবনে একবারই তিনি প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন—সেটাও তাঁর কৈশোরে; বস্তুত ছাত্রজীবনে। তারপর—আমি যতদূর জানি—তিনি কোনও প্রতিযোগিতাতেই কখনও কোনও পুরস্কার পাননি। কোনও উল্লেখযোগ্য ছবিও আঁকেননি। তবু আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম একটা-না, তিন-তিনটে অত্যাশ্চর্য 'কোয়েন্সিডেন্স' লক্ষ্য করে। কাকতালীয় ঘটনা অবশ্য যে-কোন লোকের জীবনেই ঘটতে পারে; কিন্তু যদি লক্ষ্য করে দেখি, কোনও একজন বিশেষ ব্যক্তির জীবনে 'মিলিয়ান-টু-ওয়ান' চান্স-এর কাকতালীয় ঘটনা ক্রমাগত ঘটেছে...

— মিলিয়ান-টু-ওয়ান চান্স! তিন-তিন বার? কী সেগুলি?

— প্রথম কথা, উনি জীবনে দু-দুবার ন্যাশনাল লটারিতে প্রথম পুরস্কার পেয়ে দুবারই বেশ কয়েক লক্ষ গিল্ডার্স উপার্জন করেন! আমার তো অল্প বয়স, আপনি স্যার আপনার দীর্ঘ



জীবনে এমন কোনো লোকের কথা শুনেছেন যে-ব্যক্তি জীবনে দু-দুবার ন্যাশনাল লটারিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে?

বৃদ্ধ ঝুঁকে পড়েন সামনের দিকে। বলেন, ঠিক কী কথা বল্‌তে চাইছ তুমি?

— দুটি বিকল্প সম্ভাবনা। এক : মীগেরেঁ এক ক্ষণজন্মার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছেন। এমন সৌভাগ্য শতাব্দীতে একজনের হয় কি না সন্দেহ! অর্থাৎ জীবনে দু-দুবার জাতীয় লটারীর প্রথম পুরস্কার পাওয়া। দুই : উনি আদৌ কোনও পুরস্কার পাননি। অর্থাৎ লটারিতে। পেয়েছেন একটা গুপ্তধন! যার কথা উনি দুনিয়াকে জানাতে চান না, জানাতে পারেন না। তাই নিজেই ঐ পুরস্কারপ্রাপ্তির কথাটা রটনা করেছেন!

বার্নিনী মাথা নেড়ে বলেন, যুক্তিপূর্ণ কথা। তুমি কি খোঁজ নিয়েছিলে সরকারী ন্যাশনাল লটারীর অফিসে?

— হ্যাঁ, নিয়েছিলাম। কোনও হদিস্‌ করতে পারিনি। একক প্রচেষ্টায় আমি বেশিদূর অগ্রসর হতেল পারিনি। তাছাড়া ঐ সময়েই হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করে বসল। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। লোরেন বলেন, তুমি তিন-তিন্‌টি কাকতালীয় ঘটনার উল্লেখ করেছিলে। দুটো তো লটারী। তৃতীয়টা?

— তৃতীয়টা হচ্ছেন ভেরমিয়ার!

— ভেরমিয়ার? মানে?

— ডক্টর বার্নিনী আমাকে সংশোধন করে দেবেন, আমি যদি কিছু ভুল বলি। ভেরমিয়ার মারা যান 1675 খ্রীস্টাব্দে। প্রথম দুশ বছর কেউ তাঁকে চিনত না, তাঁর নামই শোনেনি। ভেরমিয়ারকে বস্তুত আবিষ্কার করলেন বুর্গে, 1866 খ্রীস্টাব্দে। তারপর সেই 1866 থেকে 1936 এই দীর্ঘ সত্তর বছরের ভিতর মাত্র খান-পঁচিশ অরিজিনাল ভেরমিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। কারও মতে বিশখানি, কারও মতে ত্রিশখানি। প্রত্যেকটি চিত্রের বিষয়বস্তু 'জেন্‌রি-পিকচার' — হল্যান্ডের মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য জীবনের ছবি। প্রত্যেকটির মূল্য কোটি টাকার কাছাকাছি। এগুলি বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ব্যক্তি খুঁজে পেয়েছেন। এথেন্স থেকে লন্ডন, মাদ্রিদ্‌ থেকে স্টকহম। এবং যাঁরা তৈল-চিত্রগুলি উদ্ধার করেছেন তাঁরা ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভাষার, ভিন্ন পরিবেশের মানুষ। আর তার পরেই একটা অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনা—1937 থেকে 1943—মাত্র ছয় বছরে যুদ্ধব্যস্ত পৃথিবীতে অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হল নয়খনি ভেরমিয়ার—বছরে গড়ে দেড়খানি করে!

— আশ্চর্য! —বৃদ্ধ বলে ওঠেন নিজের অজ্ঞাতেই।

— না স্যার! তুরুপের টেক্কাখানি আমি এখনও দাখিল করিনি!

— তুরুপের টেক্কা?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। ঐ নয়খানি ছবিই পাওয়া গেল যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সে! এবং দেখা যাচ্ছে ঐ নয়খানি ছবির প্রত্যেকখানি কোন-না-কোন এক সময়ে ছিল হান ভাঁ মীগেরেঁর সংগ্রহশালায়।

— 'কোনো-না কোন এক সময়ে' মানে?

— একক প্রচেষ্টায় আমি খুব বিস্তারিত সন্ধান নিতে পারিনি। তবে এটুকু জেনেছি, নয়খানির মধ্যে অন্তত পাঁচখানি ছবির আবিষ্কর্তা হান ভাঁ মীগেরেঁ স্বয়ং। তিনিই সেগুলি অখ্যাত অজ্ঞাত কোনও অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করে উপহার দিয়েছেন বিশ্বললিতকলাকে!

বার্নিনী বলেন, আশ্চর্য! তাই নাকি?
বৃদ্ধ লোরেন কিন্তু এবার অন্য কথা বললেন, একটা কথা বুঝিয়ে বল তো অ্যাগনেস্? তুমি নিজেই বলেছ—হান ভাঁ মীগেরেঁ বর্তমান ডাচ-শিল্পীদের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব নন। সেক্ষেত্রে তুমি তাঁর বিষয়ে এত কৌতূহলী হয়ে পড়লে কেন? মীগেরেঁ সম্বন্ধে তুমি এমন সব তথ্য এখন দাখিল করছ যাতে বার্নিনীর মতো আর্ট কনৌশার পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছেন! এর মানে কী?
অ্যাগনেস্ তৎক্ষণাৎ দাখিল করে তার কৈফিয়ৎ : আমার সে-সময়ে সন্দেহ হয়েছিল মিস্টার মীগেরেঁ কোন একজন মধ্যযুগীয় ধনকুবেরের একটি চিত্রশালার সন্ধান পেয়েছেন! সেখানেই সঞ্চিত হয়ে ছিল ঐ অনবদ্য ভেরমিয়ারগুলি, কয়েক শতাব্দী আগে। তিনি সেই ভূগর্ভস্থ চিত্রশালা থেকে একের-পর একটি চিত্র উদ্ধার করে আনছেন—দু-এক বছর সময়ের ব্যবধানে। গড়ে বছরে দেড়খানি করে! সত্য কথাটা তিনি বলতে পারছেন না— কারণ হয়তো সেই মধ্যযুগীয় ধনকুবের একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি। নামটা জানাজানি হলে তাঁর অধঃস্তন পুরুষেরা ছবিগুলির মালিকানা দাবী করে বসবে। অথবা সব কিছু জাতীয় সম্পদ বলে গণ্য করা হবে।
বৃদ্ধ ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। বললেন, তুমি যা বললে তা অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা। কিন্তু সেক্ষেত্রে এতবড় খবরটা তুমি এতদিন গোপন রেখেছিলে কেন বল তো?
— প্রথম কথা যুদ্ধের ডামাডোলে এ খবরটা আদৌ কোনও গুরুত্ব পেত না। দ্বিতীয়ত—আমি আমার সন্দেহের কথা ববকে খুলে বলেছিলাম। সে আমাকে মন্ত্রগুপ্তির পরামর্শই দিয়েছিল। বলেছিল, যুদ্ধ মিটে গেলে—ঐ গোপন চিত্রশালার গুপ্তধন আমরা যৌথভাবে খুঁজে বার করব। তারপর বেচারি বব্, স্ট্রীট ফাইটিং-এ..
— আই নো, আই নো! শোন অ্যাগনেস্! তাহলে সে কাজটা শেষ করার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। তুমি কি একজন পুরুষ সহকারী চাও? আমি তোমাকেই ঐ 'অপারেশন মিসিং ভেরমিয়ার'-এর দায়িত্বটা দিতে চাই।
বার্নিনী বলেন, কিন্তু মীগেরেঁ তো এখন আমস্টার্ডামের জেল হাজতে?
— তাতে কী? আমরা তো মীগেরেঁকে খুঁজছি না! আমরা খুঁজছি সেই টুটেনখামেনের ক্যাটাকুম্বটা—সেই যেখানে ভূগর্ভস্থ সংগ্রহশালায় থরে থরে সাজানো আছে নানান শিল্পসম্পদ! অ্যাগনেস্, তুমি বরং আমাকে সংক্ষেপে বলতো—হান ভাঁ মীগেরেঁর জীবনটা। মানে যেটুকু তুমি জেনেছ।
অ্যাগনেস্ বললে, আমার নোটবই দেখে সঠিক বলতে পারব। তবে মোটামুটি কথা আমার মনেই আছে। শুনুন : হান ভাঁ মীগেরেঁর জন্মস্থান হচ্ছে ডেভেন্ডার—বিখ্যাত ডাচ শিল্পী তাবোর্গ-এর জন্মস্থলে। আমস্টার্ডাম থেকে আশি কিলোমিটার পুব দিকে। ওঁর জন্ম 1889 সালে।
বাধা দিয়ে বৃদ্ধ সম্পাদক বলে ওঠেন, ফর য়োর ইনফরমেশন অ্যাগনেস্ : বছরটা ক্ষণজন্মাদের! ঐ বছরই জন্মেছিল অ্যাডল্ফ্ হিটলার, জন্মগ্রহণ করেছিলেন চার্লি চ্যাপলিন। যা হোক, তারপর?
— ওঁর বাবা অঁরিকুস্ মীগেরেঁ ছিলেন কড়া স্কুলমাস্টার। আঁক কষার বদলে ছেলে ছবি আঁকছে শুনলে তাকে ধরে পিটতেন। হান-ভাঁ তাই লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি আঁকত। সৌভাগ্য, ওঁর মা প্রাকবিবাহ জীবনে গান গেয়ে উপার্জন করতেন, ছবি আঁকতেন। জন্মগত সূত্রে মীগেরেঁ যদি ললিতকলার দিকে ঝুঁকে থাকেন, তবে সেটা তাঁর মায়ের কল্যাণে। বাপের সঙ্গে বস্তুত ঝগড়া



করে হান ভর্তি হয়েছিলেন দেল্ফৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্থাপত্য বিষয়ে ডিগ্রি নিতে। পাশ করে বেরিয়ে আসার আগে ছাত্রজীবনেই তিনি একটি দুর্লভ পুরস্কার পেয়েছিলেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বছর অন্তর একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতা হত। পাঁচ বছরের বাছাই করা শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে একটি স্বর্ণপদক দেওয়া হত। হান মীগেরেঁ সেই দুর্লভ প্রাইজটা পেয়েছিলেন। তিনি কী এঁকেছিলেন তা অবশ্য জানি না—
ডক্টর বার্নিনী বলেন, আমি জানি—। উনি এঁকেছিলেন রটাডার্মের একটি গীর্জার নিসর্গ-চিত্র। পরে সেটি একশ পাউন্ডে বিক্রি হয়ে যায়।
— তা হবে। তা সে যাই হোক, মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে হান একটি ছাত্রীর প্রেমে পড়েন। অনতিকালে পরেই বান্ধবীটি গর্ভবতী হয়ে পড়ায় হান তাকে বিবাহ করতে বাধ্য হন। সেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে—1913 সালে। এজন্য বাবা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। হান বাধ্য হয়ে কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে রোজগারের নানান ধান্দা দেখতে থাকেন। ছবি আঁকা ছাড়া আর কোন বিদ্যা জানা নেই। অথচ ওঁর ছবি বাজারে বিক্রি হচ্ছে না। প্রচণ্ড অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে পড়লেন হান মীগেরেঁ। ক্রমে সেই স্ত্রীর গর্ভে ওর দুটি সন্তান জন্মায়। প্রথমটি পুত্রসন্তান, দ্বিতীয়টি কন্যা । তারপর এগারো বছর বিবাহিত জীবনান্তে ওঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। হেতুটি মর্মান্তিক—হান ইতিমধ্যে 'জো'-র প্রেমে পড়েছেন! 'ইতিমধ্যে' মানে প্রায় আট বছর আগে। জোহান—বিবাহিত। 'জো' সেই আট বছর ধরে ছিল হান মীগেরেঁর 'মিস্ট্রেস্'! প্রথমা পত্নীর চোখের আড়ালে। সে যাই হোক, প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে হান যখন ঐ জোহানকে বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশ। প্রথমা স্ত্রী অ্যানা মীগেরেঁ হতাশায় ভেঙে পড়েন। তিনি আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে নাবালক পুত্র-কন্যাকে নিয়ে ডাচ উপনিবেশ—'ডাচ-ঈস্ট-ইন্ডিজ'-এ চলে যান। দ্বিতীয়া স্ত্রী জোহানার গর্ভে মীগেরেঁর কোনও সন্তানাদি হয়নি। 1916 সালে হান মীগেরেঁর প্রথম একক প্রদর্শনী হয়েছিল—প্রথম ও শেষ। তখন তিনি সাতাশ বছরের নওজোয়ান। সংসারে স্ত্রী অ্যানা আর দুটি সন্তান। হান প্রচুর খরচপাতি করে, বস্তুত সর্বস্ব বন্ধক দিয়ে এই একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী আশা করেছিলেন, প্রদর্শনীতে বহু ছবি বিক্রি হবে। হল না। আশা ছিল—ঐ প্রদর্শনীতে হান চিত্রশিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন। তাও পেলেন না। সংবাদিকেরা সকলেই মুখ ফিরিয়ে রইল।
আমস্টার্ডামের নামকরা কোন চিত্রসমালোচক প্রদর্শনী দেখতে আসেননি আদৌ।
ডক্টর বার্নিনী ওকে সংশোধন করে বললেন, না, 'কেউই আসেননি' বলাটা তোমার ঠিক হল না অ্যাগনেস্।
— হয় তো হল না। অঙ্কের হিসাবে তখন আমার বয়স এক বছর। প্রত্যক্ষজ্ঞানে আমি কিছুই জানি না—যা শুনেছি...
— পার্দঁ শ্যাম্পেন! তাহলে আমার কাছে ঐ অধ্যায়টুকু শুনে নাও। কারণ আমি সেই একক-প্রদর্শনীর নিমন্ত্রিত দর্শক ছিলাম। আমি উপস্থিত ছিলাম!
— রিয়েলি? বলুন তাহলে, আপনি প্রত্যক্ষজ্ঞানে কী জানেন?
— মীগেরেঁর সঙ্গে সে-আমলে আমার পরিচয় ছিল না। ওর নামই শুনিনি। আমি নিজেও তখন শিল্প-সমালোচক হিসাবে খুব কিছু পরিচিত নই। তবু ওর নিমন্ত্রণ পেয়ে গেছিলাম। মীগেরেঁ

বোধকরি আমার চেয়ে বছর ছয়-সাতের ছোট হবে। তুমি ঠিকই বলেছিলে—ও সর্বস্ব পণ করে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। মীগেরেঁ আর তার প্রথমা স্ত্রী : অ্যানা। অথচ নামকরা চিত্রশিল্পী, সমালোচক, সাংবাদিকেরা বিশেষ কেউ আসেননি। আমার খুব খারাপ লেগেছিল। উদীয়মান কোন শিল্পীর প্রতি এ জাতীয় উপেক্ষায়, প্রতিষ্ঠিত শিল্পসমালোচরা আদৌ বিব্রত হন না। তাঁরা একবারও ভেবে দেখেন না—সে ছোকরা কী-ভাবে ঘড়ি-আংটি বন্ধক দিয়ে 'হল'-ভাড়া মিটিয়েছে; নিমন্ত্রণপত্র ছেপেছে, বাড়ি-বাড়ি চিঠি বিলি করেছে। ছবিগুলো কী জাতের ছিল তা আজ আর মনে নেই, কিন্তু একটা ঘটনার কথা মনে আছে। প্রদর্শনীর শেষ দিনে মীগেরেঁ মরিয়া হয়ে ধরে এনেছিল ডক্টর ব্রেডিউস্‌কে। তুমি তো জানই, ডক্টর ব্রেডিউস্ সমগ্র হল্যান্ডের সর্ববিখ্যাত কলাসমালোচক। তিনি যদি 'ভিজিটার্স বুক'-এ দু একটি ভাল মন্তব্য করে যান তাহলে ঐ নিঃস্ব শিল্পী একটা আশার আলোক দেখতে পায়। সেই বিশ্বাসেই মীগেরেঁ ওঁকে প্রায় পাকড়াও করে ধরে এনেছিল। আমি তখন প্রদর্শনীকক্ষে হাজির। ডক্টর ব্রেডিউস্ ছবিগুলো ভাল করে দেখলেনও না। এক নজর চোখ বুলিয়েই বলে উঠলেন, 'এসব ছবি দেখাতে তুমি আমাকে গাড়িভাড়া করে ধরে এনেছ? শোন বাপু, সোজা কথা বলি—সকলের পক্ষে সব কাজ হয়না। তোমার দ্বারা ছবি আঁকা হবে না। রাগ কর না। এটা ভবিতব্য। ভগবান কাউকে সে ক্ষমতা দেন, কাউকে দেন না। তোমার এখনো বয়স আছে, অন্য কোন প্রফেশনে নেমে পড় বরং...' আমার স্পষ্ট মনে আছে মীগেরেঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। কে একজন মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বলে ওঠেন, 'সত্য-কথা কিন্তু মিষ্টি করেও বলা যায় ডক্টর ব্রেডিউস্!' কে বলেছিলেন মনে নেই, কিন্তু তিনিও একজন নামকরা চিত্র সমালোচক—একেবারে ব্রেডিউস্-এর পর্যায়ের আর্টকনৌশার না হলেও। বোধহয় ডক্টর ব্রুন। সে যাহোক, আমার এ-কথাও মনে আছে—ডক্টর ব্রেডিউস্ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'সেটা ঐ ছোকরার বদ-হজম ঘটাবে শুধু! মিষ্টি-কথায় ভুলে আরও পাঁচ-সাত বছর আলেয়ার পিছনে ছুটবে—তখন আর কেরানি কিংবা মটোর মেকানিক হবার বয়স আর ওর থাকবে না!'

বৃদ্ধ লোরেন বলেন, অত বিস্তারিত আমাদের না শুনলেও চলবে। মীগেরেঁর জীবনের ঘটনা তারপর কী জান, বল?

অ্যাগনেস্ আবার তার কাহিনীর সূত্র তুলে নেয় : ওঁর প্রথমা পত্নী অ্যানা, ডাচ-ইন্ডিজ-এ চলে গেলেন, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। জোহানা এরপর বিবাহ-বিচ্ছেদ করেন তাঁর প্রথম স্বামীর সঙ্গে। এখন আর কোন বাধা নেই। হান মীগেরেঁ অতঃপর জোহানাকে বিবাহ করেন। আমি যতদূর জানি, জোহানার কোন সন্তানাদি হয়নি—না প্রথম বিবাহের ফলে, না মীগেরেঁকে বিবাহ করায়। মোট কথা জোহানাকে বিবাহ করার পর মীগেরেঁ হল্যান্ড ছেড়ে চলে যান। এসে আশ্রয় নেন দক্ষিণ ফ্রান্সে। রোকেব্রুন-এ। সেখানে থাকতেই নাকি তিনি পর পর দুবার লটারির টিকিটে হঠাৎ ধনকুবের হয়ে যান। এর পর থেকে তাঁর জীবন কুয়াশা ঢাকা। তাঁর বাড়ির সামনে ফটকে বন্দুকধারী দ্বারপাল, ভিতরে ভ্যালে, প্রাইভেট সেক্রেটারি। বাহিরে বাগানে চেন-খোলা ব্লাড-হাউন্ড। আর প্রবেশপথে বড় বড় হরফে লেখা : কুকুর হইতে সাবধান।

লোরেন বলেন, এবং তোমার হিসাব মতো মীগেরেঁ যে সময় দক্ষিণ ফ্রান্সে এসে অজ্ঞাতবাস শুরু করেন তার পর থেকেই বিশ্বললিতকলায় পরপর নয়খানি 'ভেরমিয়ার' আবিষ্কৃত হয়?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। যার তিন-চারখানির আবিষ্কারকর্তা স্বয়ং হান ভাঁ মীগেরেঁ!



— বুঝলাম! তুমি তৈরী হয়ে নাও অ্যাগনেস্। দু-চার দিনের মধ্যেই তোমাকে আমস্টার্ডামে যেতে হবে। মীগেরেঁর ইন্টারভিয়ু নিতে।

— কিন্তু সে তো এখন জেল হাজতে? — পুনরায় বলেন ডক্টর বার্নিনী।

— তাতে কী? আমস্টার্ডামের পুলিস কমিশনার ডি-ভেলডি আমার পরিচিত। আমার অনুরোধ সে এড়াতে পারবে না। ফিগারোকে সে একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিয়ু নিতে দেবে।

আসর ভেঙে গেল।

## ।। তিন ।।

আঠাশে মে থেকে বারই জুলাই—কম দিন নয়। পাক্কা দেড় মাস পুলিস-হাজতে লড়াই করেছে সে। তারপর ও ভেঙে পড়ল। আদ্যন্ত স্বীকার করল তার প্রবঞ্চনার ইতিকথা।

জেলখানার নির্জন পরিবেশে এই দেড়মাসে মীগেরেঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। বছর-দুই আগে তেতাল্লিশ সালে জোহানার সঙ্গে ওর বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেছে। নাহলে এই নিঃসঙ্গতার ভাগ নিতে সে হতভাগী নিশ্চয় ছুটে আসত। অন্তত ভিজিটিং আওয়ার্সে লোহার জালতির ওপাশে এসে দাঁড়াতো জোহানা। চৌদ্দ বছরের বিবাহিত জীবন—তার আগেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল দুজনের, অ্যানার চোখের আড়ালে। আচ্ছা, জো কি জানে খবরটা? ওর এই বন্দী হবার দুঃসংবদটা? নিশ্চয় জানে । মীগেরেঁর গ্রেপ্তার হবার খবর তো সবকটা কাগজ ফলাও করে ছেপেছে। পুলিস বিখ্যাত আর্ট ডীলার হান ভাঁ মীগেরেঁর উপর মানসিক অত্যাচার করে প্রমাণ করতে চাইছে একটা দুষ্টচক্রের অস্তিত্ব—যারা যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষকে জাতীয় সম্পদ বিক্রয় করে দিয়েছে। সংবাদপত্রের কাছে খবরটা মুখরোচক; তাই নানান সাংবাদিক ওস্তাদ নানান যুক্তিতর্ক পেশ করে কাগজের পাতা ভরাচ্ছেন। জোহানার কি তা নজরে পড়েনি? মীগেরেঁ নিজে ছাড়া একমাত্র সেই হতভাগীই হয়তো জানে — ও অভিযোগ একেবারে ফাঁকা বুলি! গোয়েরিঙ বা তা দলবলের কাছে যদি কোন হতভাগা কোনও বিখ্যাত ছবি বিক্রয় করে থাকে, তবে তা মীগেরেঁর জ্ঞাতসারে হয়নি, হতে পারে না। কারণ জার্মান-অধিকারের অনেক আগেই মীগেরেঁ সস্ত্রীক সরে গিয়েছিল দক্ষিণ-ফ্রান্সে। অথচ মূর্খ পুলিসগুলো ওকেই আঁকড়ে ধরে দুষ্টচক্রটার সন্ধান করতে চাইছে। জোহানা খবরের কাগজ পড়ে, সব কিছুই সে জানতে পেরেছে। ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। কারণ এই পৃথিবীর কয়েক কোটি মানুষের মধ্যে একমাত্র জোহানাই বোধকরি জানে ওর সত্য পরিচয়!

'সত্য পরিচয়'?

না। সেটা মীগেরেঁর 'সত্য পরিচয়' নয়। সেটাও তার মিথ্যা পরিচয়! যদিও সেটা তার গোপন কথা। হান ভাঁ মীগেরেঁর অন্তরে যে বেদনা, যে প্রকাশের যন্ত্রণা, যে বিদ্রোহ — তার খবর জোহানা কোনদিন পায়নি। সে 'সত্য পরিচয়' পাওয়ার চেষ্টাই করেনি জোহানা। কেমন করে করবে? সে যে ভিন্ন ধাতুতে গড়া। মনের দিক থেকে স্বামী-স্ত্রী ছিল বিপরীত মেরুর বাসিন্দা! জোহানা ছিল 'এগোইস্টিক হেডোনিজ্‌ম'-এর শিকার—আত্মকেন্দ্রিক সুখসন্ধানী। জীবন-যৌবন দ্রুত ক্ষয়িত হয়ে যাচ্ছে—যা পার কুড়িয়ে নাও। ভোগ কর; আনন্দ কর! আর মীগেঁরের অন্তরে ছিল একটা প্রকাশের যন্ত্রণা! সে 'সুন্দর'-কে খুঁজেছে, 'সত্য'-কে খুঁজেছে, এবং 'শিব'-কেও। এই রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শময় জগত-প্রপঞ্চে সে যে আনন্দরস আস্বাদন করেছে তার কথা মীগেরেঁ

উত্তরকালকে শোনাতে চেয়েছে। ক্যানভাসের উপর তুলির টানে। ওরা তাকে সে সুযোগ দেয়নি। ঐ 'ওরা'! তথাকথিত আর্ট-কনৌশার-এর দল! শিল্পবোদ্ধার দল। শিল্প-বুদ্ধুর দল! জো বুঝতে পারেনি শিল্পীর এই প্রকাশের যন্ত্রণার কথা। সে শুধু বুঝছিল যে, মীগেরেঁ এ সাফল্যের বোঝা আর বইতে পারছে না, পারবে না। ধরা মীগেরেঁ পড়েনি—কোনও পণ্ডিত-মূর্খই বুঝতে পারেনি মীগেরেঁর হস্তলাঘবতার কথা। দুনিয়ার বিরুদ্ধে মনে মনে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল শিল্পী—ঐ তথাকথিত আর্ট-কনৌশারদের বিরুদ্ধে, আর যে মূর্খ সাধারণ মানুষ ওদের মাথায় তুলে নাচে তাঁদের বিরুদ্ধে। জিতেছিল। কিন্তু জয়ের ঐ স্বর্ণমুকুটের ভার আর যেন বইতে পারছিল না। একটা মানসিক দ্বন্দ্বে সে ক্রমশঃ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল। বুদ্ধিমতী জোহানা শিল্পীর যন্ত্রণার হেতুটা প্রণিধান না করলেও পরিণামটাও আন্দাজ করেছিল। তাই সময় থাকতে সে সরে গেছে। সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে শিল্পীর সঙ্গে—সে ভেঙে পড়ার আগেই। ভালই করেছে! আহা, সে সুখে থাক! জোহানা যত বড় আত্মকেন্দ্রিক সুখসন্ধানীই হোক না কেন, সে সজ্ঞানে মীগেরেঁর সর্বনাশ করবে না। আত্মগোপন করে থাকবে বরাবর। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়বে সংবাদপত্রে ওর বিচারের বিবরণ। কিন্তু কোথায় আছে সে এখন? জুরিখ্? না কি ভিয়েনা? যেখানে ব্যাঙ্কে রাখা আছে ওর ভাগের-ভাগ? স্বামীর উপার্জনের একটা বিরাট অংশ—পাঁচ না ছয় শূন্য-ওয়ালা সুইস্-ব্যাঙ্কের একটা পাশ বই।

না, জোহানার কথা ও ভাববে না আজ। বরং আজ বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছে ওর প্রথম-প্রেমের কথা। অ্যানার মুখখানা। অ্যানা! পরিণত যৌবনা, দুই-সন্তানের জননী ওর প্রথমা স্ত্রী নয়, —বেণীদোলানো কিশোরী অ্যানা! স্কুলের ছাত্রী! যখন সে ওর হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল সংসারের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে!

অ্যানা কি আজও বেঁচে আছে? সুমাত্রাতে? মীগেরেঁ জানে না। বহুদিন তার কোন খোঁজ খবর পায়নি। আর তার সেই দুটি সন্তান? একমাথা সোনালীচুল-ওয়ালা জ্যাক আর আর ফুলের মত ফুটফুটে ঈনেভ? বা:! শুধু অ্যানার সন্তান হবে কেন তারা? ওরা দুটি তো হান ভাঁ মীগেরেঁরও সন্তান! ভারী ইচ্ছে করছিল আজ তাদের দেখতে। দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে তাদের কাছে ক্ষমাসুন্দর বিদায় চেয়ে নিতে। 'সলিটারী প্রিজন'-এ অতীত জীবনটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে।

ওর বাবা অরিঁকুস্ মীগেরেঁ ছিলেন কড়া ইস্কুলমাস্টার। ওলন্দাজ ছাত্রদের ইংরাজি, অঙ্ক আর ইতিহাস পড়াতেন। দু-চারখানা স্কুলপাঠ্য বইও লিখেছিলেন তিনি। কড়া মেজাজের লোক; শুধু স্কুলে নয়, সংসারের চৌহদ্দিতেও তাঁর কড়াশাসন অব্যাহত। এমনকি ওর মা মাদাম অগুস্তাও ভয় করে চলতেন স্বামীকে। মা ছিলেন বাবার চেয়ে চৌদ্দ বছরে ছোট। অরিঁকুস্ কাঠখোট্টা, প্র্যাগ্ম্যাটিক—সুকুমার শিল্প তার সইত না। গান-বাজনায় তার অরুচি, চিত্র-ভাস্কর্য তার মতে পণ্ডশ্রম আর কবিতা লেখা—ন্যাকামি! অথচ ওর মা— অগুস্তা—প্রাকবিবাহ জীবনে গান গাইতেন, ছবি আঁকতেন। স্বামীর ঘর করতে আসার পর অবশ্য সে সব বাতিক চাপা পড়ে গেছিল। যাবে না? একের পর এক সন্তান এসেছে যে তাঁর কোলে। হান ছিল পাঁচ ভাইবোনের মাঝের জন।

ছেলেবেলা থেকেই হানের ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক। যা দেখে তাই আঁকে। পেনসিল আর পেন-অ্যান্ড-ইংক স্কেচ। আট-নয় বছর বয়সে সে সুন্দর-সুন্দর ছবি এঁকেছে। বাপ দেখতে



পেলেই ছিঁড়ে ফেলত। আর অগুস্তা তার স্বামীকে লুকিয়ে ওকে যোগান দিত রঙ-তুলি-কাগজ! স্কুলে ভর্তি হল। ছাত্র ভালই— সব চেয়ে বেশি নম্বর পেত ড্রইং পরীক্ষায়। বাপ খাপ্পা, মা খুশি। বাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে—রীতিমত ঝগড়াঝাঁটি করে অগুস্তা ওকে ভর্তি করে দিল ড্রইং স্কুলে। চিত্রশিল্পের গুরু হলেন কোতেরলিঙ। তাঁর প্রিয় শিষ্য হয়ে উঠল অচিরে।

আঠরো বছর বয়সে দেল্ফৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হল স্থাপত্য-বিষয়ে ডিগ্রি নিতে। এখানে সে একটি দুর্লভ পুরস্কার পায়। শিল্পী হিসাবে এটা ওর জীবনে প্রথম স্বীকৃতি—শেষ স্বীকৃতিও বটে। না, সোনার পদকটার কথা ও ভাবছে না আজ—সেটা তো প্রতি পাঁচ বছর অন্তর কেউ না কেউ পায়। ও ভাবছে সোনার-বরণ মেয়েটির কথা!

ও প্রথম পুরস্কার পাওয়াতে সহপাঠীরা ওকে কাঁধে তুলে নেচেছিল। অরিঁকুস্-এর কোন ভাবান্তর নেই—ছবি-আঁকায় প্রথম হওয়া তার কাছে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাই নয়। বরং উচ্ছ্বসিত হয়েছিল অগুস্তা—পুত্রের সাফল্যে। সে রাত্রে নিজে হাতে কেক বানিয়েছিল। খাইয়েছিল ওর বন্ধুবান্ধব, সহপাঠীদের।

পরদিন সাইকেলে চেপে কলেজ যাচ্ছে, গেটের কাছে পথের মাঝে ওকে রুখল একটি মেয়ে।

-পার্দঁ! গতকাল আপনিই ঐ গীর্জার ছবিখানাতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছেন, নয়?

হান সাইকেল থেকে নামেনি। একটা পা মাটিতে ঠেকিয়ে গতিরোধ করেছে শুধু। তাকিয়ে দেখল সে মেয়েটিকে। বছর আঠারো বয়স, পুরন্ত দেহের জন্য কিছু বেশি মনে হয়। ঘন নীল চোখ আর সোনা-গলানো এক মাথা চুল। কিন্তু চুলের বাহার অথবা চোখের নীলিমা কোন তরুণীকে এমন দুঃসাহসিকা করে তোলে না। হান বলে, হ্যাঁ, সেটা কি আমার অপরাধ?

—না অপরাধ হবে কেন? অনেকেই ও জাতীয় 'গিমিক' করে থাকে!

—'গিমিক'! মানে?

—আমি জানতে চাইছি গীর্জাটা কোন শিল্পীর নকল? দি হু, না তাবোর্গ?

হান স্তম্ভিত হয়ে গেল মেয়েটির স্পর্ধায়। বললে, আপনিও বুঝে কম্পিট করেছিলেন? সান্ত্বনা পুরস্কারও পাননি?

—না! আমি ছবি আঁকি না। তবে ছবি দেখি, ছবি বুঝি। আমার বেশ মনে পড়ছে, ঐ গীর্জার ছবিখানি আমি অন্যত্র দেখেছি। কার আঁকা মনে করতে পারছি না বলেই আপনার সাহায্য চাইছি। অবশ্য যদি মনে করেন সেই স্বীকৃতিতে আপনার প্রেস্টিজ ঢিলে হয়ে যাবে, তবে থাক ও কথা!

হান দাঁতে-দাঁত দিয়ে বললে, না! আমার প্রেস্টিজ অত ঠুনকো নয়। পথের মাঝখানে কোন তরুণী এভাবে কেন কোন পুরুষকে আটকে কৈফিয়ৎ তলব করে তা আমার জানা আছে। কিন্তু এ-জাতীয় 'গিমিক'-এর কোন প্রয়োজন নেই! ঈশ্বর আপনাকে যথেষ্ট সৌন্দর্য দিয়েছেন। এভাবে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করার প্রয়োজন নেই।

—আপনি বলতে চান, গীর্জাটা 'রিয়াল-লাইফ' থেকে আঁকা? কপি নয়?

—আপনার অবিশ্বাস হলে স্কুল ছুটির পর এখানে আসবেন, আপনাকে দেখিয়ে আনব। মাইল পনের দূর। রটার্ডামের কাছাকাছি একটি প্রাচীন গীর্জা ওটা। আপনি চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে চাইলে দেখিয়ে আনতে পারি। সাইকেলের কেরিয়ারে বসতে পারবেন তো? উল্টে পড়ে যাবেন না?

মেয়েটি তার সোনালী চুলের গোছা কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, আপনাকে অতটা কষ্ট করতে হবে না। আমি সাইকেলে চেপেই আসব। আজ্ঞে না, চক্ষুকর্ণের বিবাদটা ভঞ্জন না হওয়া পর্যন্ত আমি মেনে নিতে রাজী নই—গীর্জাটা আপনি বাস্তবে দেখে দেখে এঁকেছেন। কপি করেননি।

অ্যানার সঙ্গে সেই ওর প্রথম পরিচয়। স্কুলছুটির পর মেয়েটি তার নিজস্ব লেডিজ-সাইকেল নিয়ে এসে হাজির। দুজনে পাশাপাশি সাইকেল চালিয়ে গিয়েছিল রটার্ডাম। যে দৃষ্টিকোণ থেকে হান ছবিটা এঁকেছিল সেখানে দাঁড়িয়ে মেয়েটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আবার দেখল ছবিটা। নিঃশর্ত ক্ষমা চাইল। বললে বিশ্বাস কর, আমি সত্যিই ধারণা করতে পারিনি এটা তুমি দেখে দেখে এঁকেছ পাকা আর্টিস্টের মতো! কী, ক্ষমা করলে তো?

হান মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, না! এ অপরাধের ক্ষমা অত সহজে পাওয়া যায় না!

মুখ টিপে হাসল অ্যানা। বললে, কী খেসারৎ দিতে হবে আমাকে?

— শোন বলি! এ গীর্জার ছবিখানি আমি আবার আঁকব। প্রথমবার এঁকেছি সকালের আলোয়; এবার আঁকব পড়ন্ত বেলায়। শেষ সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত ঐ একই গীর্জা।

— বুঝেছি। 'মানে', 'মনে'র মতো তুমি একই বিষয়বস্তু বিভিন্ন রৌদ্রালোকে আঁকতে চাইছ? ইম্প্রেশনিস্ট-স্টাইলে!

—হ্যাঁ! ঠিকই বুঝেছ। কিন্তু ফোর-গ্রাউন্ডে থাকবে এবার একটি পুষ্প-পশারিণী। চার্চের সিঁড়ির ধাপে সে বসে আছে তার পুষ্প পশরা নিয়ে!

— বেশ তো। আঁক না। তাতে আমার কী?

— না, কিন্তু সেই পুষ্প-পশারিণীর মাথায় থাকবে ভিশুভিয়াসী গলিত-লাভার মত সোনালী চুল, চোখ দুটি হওয়া চাই নর্থ-সীর মতো ঘন নীল, আর তার পরনে থাকবে সাদা স্কার্ট আর মেরুন রঙের ব্লাউস—ঠিক যেমন তুমি পরে আছ আজ!

— তাই বুঝি? তাতেই বা আমার কী?

— সেটাই তোমার শাস্তি! তোমাকে রোজ এসে সিটিং দিতে হবে!

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল অ্যানা! বলেছিল, সেটা আবার কোন্ জাতের শাস্তি! শিল্পীর মডেল হওয়া তো মেয়েদের দুর্লভ সৌভাগ্য। আমি ভেবেছিলাম—আরও কিছু কঠিন শাস্তি বুঝি দেবে তুমি।

— হয় তো দেব! শাস্তি পাওয়ার জন্য তুমি বেশ ব্যস্ত হয়েছ মনে হচ্ছে। কিন্তু প্রথম দিনেই কি শাস্তি দেওয়া শোভন? শাস্তি পাওয়ার জন্য তোমার কামনা-বাসনা আরও একটু তীব্র হোক না ততক্ষণ!

— অসভ্য কোথাকার!

ছবিখানা শেষ হতে প্রায় মাসখানেক লাগল।

লাগার কথা নয়। ষোল ইঞ্চি বাই দশ ইঞ্চি মাপের একটি তৈলচিত্র আঁকতে যদি এতটা সময় লাগে তাহলে পড়তায় পোষায় না। কিন্তু কী শিল্পী, কী তার মডেল—কেউই চাইছে না ছবিটা শেষ হয়ে যাক। আঁকা শেষ হয়ে গেলেই তো দুজনে পাশাপাশি সাইকেল চালিয়ে বেড়ানোর অছিলাটাও শেষ হয়ে যাবে। দুজনের একসাথে আইসক্রিম পার্লারে গিয়ে বসা, ফাঁকা রাস্তায় যৌথসঙ্গীতের আসর জমানো আর আগড়ম-বাগড়ম গল্প! অ্যানা পিতৃহীন—সংসারে আছে



মা আর বুড়ি দিদিমা। তারা জানে, মেয়ে শুধু একজনের সঙ্গে 'ডেটিং' করছে। ছেলেটি ভাল—আর্কিটেকচার-এর শেষ শ্রেণীর ছাত্র। দুদিনেই পাশ করে বের হবে। স্থাপত্যের বাজার ভাল। পশার জমতে দেরী হবে না। অঁরিকুস্ কিন্তু জানতেন না ছেলে কার সঙ্গে ডেটিং করছে, জানতেন হানের মা—অগুস্তা! অ্যানকে তিনি দেখেছেন। পুত্রবধূ হিসাবে মনোনীত করতেও আপত্তি নেই তাঁর। আর এ খবর জানতেন অ্যাবি ফারেয়া। ঐ রটার্ডামের শহরতলীর গীর্জার পাদরী। তিনি প্রায়ই এসে দেখতেন হানের শিল্পকর্ম। মাঝে মাঝে অনুযোগও করতেন, ছবিটা বড় শ্লথগতিতে এগিয়ে চলেছে সমাপ্তির পথে। তারপর একদিন। সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ আকাশ জুড়ে নামল অকাল বর্ষণ। ওরা দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে একটা গাছতলায় আশ্রয় নিল। কিন্তু চার্চের ভিতর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন পাদরী অ্যাবি ফারেয়া। ছাতা হাতে তিনি এগিয়ে এলেন ওদের উদ্ধার করতে। আশ্রয় দিলেন গীর্জার ভিতর।

দু-কামরার ছোট্ট কোয়ার্টার্স। একটি সন্ন্যাসীর শয়নকক্ষ, একটি ড্রইং-রুম । ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বেলে তিনি বার করে আনলেন বান রুটি, বিস্কিট আর ওয়াইন। এদের আপত্তিতে কর্ণপাত করলেন না। অতিথি সেবায় ব্যত্যয় হতে দেবেন না অ্যাবি ফারেয়া।

কিন্তু বৃষ্টি আর থামেই না। ক্রমে শুরু হয়ে গেল তুষারপাত। শিল্পী আর তার মডেল এজন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। হানের গায়ে একটা ফ্লানেলের শার্ট, কোট নেই; আর অ্যানা তো পরিধান করেছে তার সেই দৈনন্দিন পোশাক —সাদা স্কার্ট আর মেরুন-রঙের ব্লাউস। পাদরী বললেন রাতটা তোমরা এখানেই থেকে যাও! এই প্রচণ্ড শীতে এতটা সাইকেল চালিয়ে ফেরা যাবে না। বিশেষ, ঝোড়ো হাওয়াটা বইছে ওদের গতিমুখের দিক থেকে। অ্যানা ইতস্তত করছিল, অ্যাবি ফারেয়া কর্ণপাত করলেন না। বললেন, বুঝেছি তোমাদের ইতস্তত করার হেতুটা। ভয় নেই — এটা চার্চ। আমি কাল সকালে নিজে গিয়ে তোমার বাবাকে সব কথা বুঝিয়ে বলব।

অ্যানা বললে সে পিতৃহীন। শুধু মা আর দিদিমা আছেন।

— ঠিক আছে। তাঁরা বুঝবেন। আমার এখানে দুটি ঘর। আমি আর ঐ চিত্রকর— কী যেন নাম তোমার? —আমরা দুজন শোব বাইরের ঘরে। আর তুমি থাকবে আমার বেডরুমে।

হান বললে, আমার নাম হান মীগেরেঁ, ফাদার!

— অলরাইট হান। তুমি আর আমি আজ শোব বাইরের ঘরে।

সেই মতই ব্যবস্থা হল। অ্যানা গরীব ঘরের মেয়ে। ঘরকন্নার কাজ জানে। ইলেকট্রিক স্টোভে তিনজনের নৈশাহার বানিয়ে নিল। অ্যাবি ফারেয়া অনেক গল্পগাছা করলেন! তাঁর ব্যবস্থামত রাত্রে শয়নের আয়োজন হল।

পরদিন তিনি ওদের সঙ্গে এলেন ডেভেন্টারে। সাইকেলে নয়, ঘোড়ায় চেপে। তাঁর একটি ঘোড়া ছিল, গীর্জার সম্পত্তি। অ্যাবি ফারেয়া এসে নিশ্চিন্ত করে গেলেন অ্যানার মা আর দিদিমাকে। অনূঢ়া কন্যা ডেটিং করতে গিয়ে সারারাত যদি না ফেরে তবে সেটা সে-আমলের হল্যান্ডেও একটা নৈতিক অপরাধ বলে ধরা হত। অ্যানার মা-দিদিমা নিশ্চিন্ত হলেন। অ্যাবি ফারেয়া শুধু একটি কথা বলতে ভুলেছিলেন। আজন্ম ব্রহ্মচারী হয়তো সেই ঘটনার তাৎপর্যটুকু প্রণিধান করতে পারেননি। পূর্বরাত্রে একবার তাঁকে ঘণ্টাখানেকের জন্য গীর্জার বাইরে যেতে হয়েছিল। ঝড়-বৃষ্টি থেমে যাবার পর। একজন মৃত্যুপথযাত্রীর শেষকৃত্য করতে! সেই ঘণ্টাখানেকের অনুপস্থিতিতে চার্চে কী ঘটেছিল তা তিনি কল্পনা করতে পারেননি। প্রত্যক্ষজ্ঞানে তিনি

জানতেন—তিনি শেষকৃত্য করতে যাবার পর হান ড্রইং-রুমের অর্গল রুদ্ধ করে দেয়, আর ঘণ্টাখানেক পরে এসে যখন তিনি দরজায় করাঘাত করেন তখন আবার তাঁর তরুণ অতিথি দ্বার মোচন করে দিয়েছিল!

বৃদ্ধ হান ভাঁ মীগরেঁ এই নির্জন বন্দী আবাসে সেই অবাকরাত্রির কথাটা মনে করতে চাইলেন। প্রায় আটত্রিশ বছর আগেরকার একটি বিশেষ রাত্রি। সব কথা মনে পড়ে না—কিন্তু প্রথম প্রেমের, প্রথম আত্মনিবেদনের কথা কি একেবারে ভোলা যায়?

কিন্তু আনন্দ আর দুঃখ আসে পর্যায়ক্রমে, রৌদ্রকরোজ্জ্বল গ্রীষ্মের পর হিমেল শীতের মতো। অঁরিকুস্ পুত্রকে ত্যাগ করলেন, হান ক্ষান্ত হল না তাতে কলেজ থেকে নাম কাটা গেল। অ্যানার হাত ধরে হান মীগরেঁ বেরিয়ে এল রাস্তায়। সেই আনন্দঘন রাত্রিটির স্বীকৃতি দিল সেই চার্চে গিয়ে। বিবাহ করল অ্যান্যাকে। তার হবু-সন্তানের জননীকে।

এরপর একটানা জীবনযুদ্ধ! দুঃসাহসিকা বটে সেই কিশোরীটি। এক-কামরা খুপরি ঘরে কী-করে যে সে সংসার চালাতো, স্বামী ও সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করত, তার হিসাব জানে না হান। ডক-ইয়ার্ডে মেহনতি মজদুরের কাজের অভাব নেই—কিন্তু অ্যানা কিছুতেই তাতে রাজী হতে পারে না। বলে, ও সব কথা মনেও এন না! তুমি শুধু ছবি এঁকে যাও! একের পর এক! আজ তোমার ছবির বাজার নেই, কিন্তু একদিন শত শত গিল্ডারে তোমার ছবি বিক্রি হবে!

মূর্খ অ্যানা! শত শত নয়, এমনকি হাজার-হাজার গিল্ডারেও নয়। হান ভাঁ মীগরেঁর তৈলচিত্র একদিন লক্ষ লক্ষ গিল্ডার্সে বিক্রি হয়েছে! কিন্তু সেটা দু-চোখ মেলে দেখবার অবকাশ পায়নি সেই দুঃসাহসিকা! সে শুধু বেদনার ভারটুকুই বহে গেছে, সুখের মুখ দেখেনি কোনদিন!

জীবনের প্রথম বেয়াল্লিশটা বছর শিল্পী হিসাবে হান মীগরেঁ আদৌ কোন স্বীকৃতি পায়নি। মাঝে মাঝে স্বল্পমূল্যে সে ছবি বেচেছে। অধিকাংশই ফটো-দেখে-আঁকা জেন্‌রি পিকচার। তাতেই কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। সাতাশ বছর বয়সে যখন ওর প্রথম একক-প্রদর্শনীর আয়োজন হয় তখনো ও অনেক-অনেক স্বপ্ন দেখতো। এই কয় বছরে সে খান-পঞ্চাশ ছবি এঁকেছে স্ব-ইচ্ছায়। অর্থাৎ গ্রুপ ফটোগ্রাফ থেকে সদ্যমৃত কোন একজনের পোর্ট্রেট্ নয়। সেগুলি আঁকতে হত গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনে । শীতকালে যাতে ফায়ার-প্লেসটায় আগুন জ্বলে। ঐ খান-পঞ্চাশ ছবি শিল্পীর খেয়ালখুশির স্বাক্ষর। যাতে প্রতিফলিত হয়েছে শিল্পীর স্বাধীনসত্তার স্বরূপ। শুধু হান একা নয়, অ্যানারও দৃঢ় বিশ্বাস—সেগুলি যখন একত্রে প্রদর্শিত হবে তখন আমস্টার্ডাম, হেগ থেকে বড় বড় শিল্পবিশারদের দল এসে দেখবেন। স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে সবাই স্বীকার করবেন ওর কৃতিত্ব। জ্যাকের বয়স তখন বছর চারেক, আর তার ছোট বোন ঈনেভ সবে হাঁটতে শিখেছে। তবু সংসার সামাল দিয়ে অ্যানা এসেছিল প্রদর্শনীকক্ষে ছবি টাঙাতে। ফুল দিয়ে সাজাতে। আশ্চর্য-মেয়ে ! কী-জানি-কী-করে মেয়েটার ধারণা হয়েছিল-হান মীগরেঁ এক দুর্লভ প্রতিভার শিল্পী। জাত আর্টিস্ট! সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী। শুধু 'সমকাল' তাকে চিনতে পারছে না—এই যা! তা তো অনেকের ক্ষেত্রেই হয়েছে। ভেরমিয়ার, ভ্যান গখ্, পল গোগ্যাঁ কেউই তো সমকালের কাছে স্বীকৃতি পাননি। তাই বলে তাঁরা ব্যর্থ? ঠিক তেমনিভাবে হান ভাঁ মীগরেঁর প্রতিভার স্ফুরণ একদিন হবেই—দুনিয়াকে একদিন নতমস্তকে স্বীকার করতে হবে অ্যানাই ঠিক বুঝেছিল, সমকাল ঐ শিল্পীকে বুঝে উঠতে



পারেনি। এই বিশ্বাসের পুঁটুলিটাকে আঁকড়ে ধরে সেই বাইশ বছরের মেয়েটি সব কিছু করেছে। উনিশ বছর বয়সে ওয়েডিং গাউন পরে ঐ বাপে-তাড়ানো বেকার ছাত্রটির ঘর করতে এসেছে; দু-দুটি সন্তানকে জন্ম দিয়েছে, মানুষ করেছে, আর আজ তার সর্বস্ব বন্ধক দিয়ে স্বামীর একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে! উদ্বোধনের আগের রাত থেকে ভাঙা-হাটের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে প্রদর্শনীকক্ষের দ্বারপথে—জনে জনে বাড়িয়ে ধরেছে 'ভিজিটার্স-বুক': কিছু লিখে দিয়ে যান! মেয়েটাকে তার দাদার জিম্মায় বসিয়ে সে ঘরাঞ্চিতে চড়ে নিজে-হাতে দেয়ালে পেরেক ঠুকেছে। সার দিয়ে ছবিগুলি টাঙিয়েছে। ঈনেভকে প্যারাম্বুলেটারে বসিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে ফুলপট্টিতে। গোছা-গোছা টুলিপ আর গ্ল্যাডিওলাই এনে সাজিয়েছে প্রদর্শনী কক্ষটা—যেন ছবির একজিবিশন নয়, ওরই ফুলশয্যা! খরচ মেটানো যাবে না বলে শেষ মুহূর্তে যখন হান বেঁকে দাঁড়িয়েছিল তখন ঐ মেয়েটাই তাকে ধমকে ঠাণ্ডা করেছে। কোথা-থেকে -কী-করে সেই চরম মুহূর্তে হানের হাতে তুলে দিয়েছিল এক-থলে গিল্ডার্স! তখন বুঝতে পারেনি, বুঝবার মতো সময়ও ছিল না—পরে টের পেয়েছিল। ওয়েডিং-রিং আর সেই সোনার পদকটি বাদে সমস্ত গয়নাই মেয়েটি জমা রেখেছিল 'পন-ব্রোকার্স-শপে'। বন্ধকী-ঋণের বেড়াজালে। ধনকুবের মীগরেঁর আজও স্পষ্ট মনে আছে—সবগুলি অলঙ্কার ফিরিয়ে আনা যায়নি। খরচ-খরচা মিটিয়ে হাতে প্রায় কিছুই ছিল না। মাত্র খান-সাতেক বিক্রি হয়েছিল প্রদর্শনীতে। তাও জলের দামে! বন্ধকী-দোকান থেকে গহনাগুলো হয়তো ফিরিয়ে আনা যেত, যদি ন্যায্য দামে অন্তত কিছু ছবি বিক্রি হত। তা তো হল না! তাই অ্যানার সেই অতি সাধের গহনাগুলো—বিবাহে ওর দিদিমা যে জাপানি মুক্তোর মালাটি দিয়েছিল, মায়ের ব্রেসলেটজোড়া, আর ফিরে আসেনি। তাতে কিন্তু কোনও ক্ষোভ প্রকাশ করেনি মেয়েটা! বলেছিল— গেছে তো গেছে! আবার হবে। তুমি দেখে নিও। একদিন শত শত গিল্ডার্সে তোমার ছবি বিক্রি হবে!

শত শত! বোকা মেয়ে!

কিন্তু যেদিন ওর আঁকা ছবি ষোল লক্ষ গিল্ডার্সে বিক্রি হল তখন কোথায় সেই হতভাগিনী? ওর জীবনের প্রথম-প্রেম : অ্যানা? তখন উত্তীর্ণ-যৌবনা মেয়েটির দৃষ্টিভঙ্গিটাও বদলে গেছে। তখনও তার ছিল অর্থকষ্ট—কিন্তু তখন সে 'পূর্বজীবনের বেদনার স্মৃতি' বইতে অপারগ!

ট্র্যাজেডি সেটা নয়! 'পূর্বজীবনের বেদনার'-কথাটা অ্যানা জানতেও পারেনি কোনদিন! ঐ একক-প্রদর্শনী দেখতেই এসেছিল জোহানা তার স্বামীর হাত ধরে। সেখানেই বিবাহিত হান মীগরেঁ আর বিবাহিতা জোহানার চারচক্ষুর প্রথম মিলন। আর সেই প্রদর্শনীকক্ষেই সদ্য-পরিচিতাকে শিল্পী উপহার দিয়েছিল একগুচ্ছ টুলিপ আর গ্ল্যাডিওলাই। নুন-আন্তে-পান্তা-ফুরানো সংসারের গৃহিণীর সংগৃহীত পুষ্পসম্ভার!

ট্রাজেডি সেটাই! হিরোইন তখন মঞ্চে অনুপস্থিত!

— বলুন মস্যুয়ে মীগরেঁ', 'অ্যাডালটারেস্' ছবিখানা আপনি কোথা থেকে উদ্ধার করেছিলেন? আর কাকে বেচেছিলেন? উঁ?

— কী আশ্চর্য! আপনারা কি আমাকে পাগল করে ছাড়বেন? বলছি তো, আমার মনে নেই! আমি জানি না! আমি জানি না, জানি না!

সলিটারি প্রিজন। একটা বিছানা, টেবিল-ল্যাম্প, লিখবার টেবিল। ইজিচেয়ার। সংলগ্ন বাথরুম। উপরে জানলা। তা দিয়ে বাঁকা হয়ে রোদ এসে পড়েছে মেঝেতে। হয়তো এখন আমস্টার্ডামের

পথে পথে বার হয়ে পড়েছে শহরবাসীরা। স্কুলে যাচ্ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। তে-চাকার গাড়িতে হকাররা নানান সওদা নিয়ে ফিরি করতে বেরিয়েছে। জানলাটা অত উঁচুতে কেন? কিছুই দেখা যায় না বাইরের দৃশ্য। দিনের মধ্যে আট-দশবার ওরা আসে। একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। গণ্ডমূর্খগুলো কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, গোয়েরিঙ-এর সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। সে লোকটাকে কোন দিন চোখেই দেখেনি। শুধু সে কেন, কোন হতভাগা নাৎসী সমরনায়ককেই সে কখনো কোন ছবি বিক্রি করেনি, ওর গোপন কথা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। সেটা ঐ মূর্খগুলো আন্দাজই করতে পারছে না। ওদের দোষ নেই। সেটা যে অবিশ্বাস্য! সব কথা এখনই ও খুলে বলতে পারে না। বলবে; তবে এখন নয়। সময় হলে। আপাতত কী যেন ভাবছিল?

হ্যাঁ, সেই 1932 সাল। জোহানাকে বিবাহ করার বছর-তিনেক পরের কথা। অ্যানা তার পুত্রকন্যাকে নিয়ে তার কয়েক বছর আগেই চলে গেছে সুদূর জাভা না সুমাত্রায়। ডাচ্ উপনিবেশ। আশ্চর্য মেয়ে : অ্যানা! কোন অভিযোগ সে আনেনি, কোন অনুযোগ করেনি। যে মুহূর্তে বুঝতে পেরেছে, তার স্বামীর ভালবাসা হারিয়েছে সেই মুহূর্তে নিঃশব্দে সরে দাঁড়িয়েছে তার জীবন থেকে। বিবাহ-বিচ্ছেদ পেতে কোনই অসুবিধা হয়নি হানের। বরং জোহানা তার প্রথম স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে বেশ বেগ পেয়েছিল। সে যা হোক, বিবাহের পরেও অর্থাভাবে জো-র সঙ্গে আনুষ্ঠানিক হনিমুনটা তিন বছর ধরে মুলতুবি ছিল। সেবার কয়েকটা ক্যানভাস্ হঠাৎ ভাল দামে বিক্রি হয়ে গেল। হাতে এল বেশ কিছু নগদ অর্থ। জো অ্যানা নয়, সে ক্ষণিকবাদিনী। ভবিষ্যৎ তার কাছে জলবুদ্বুদ, যৌবন থাকতে জীবনকে উপভোগ করার তাগিদ তার। বললে, চল দুজনে দক্ষিণ-য়ুরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি।

মীগেরেঁ রাজী হল। ওরা প্রথমে গিয়েছিল সুইৎজারল্যান্ড। তারপর ভিয়েনা হয়ে ইতালী। ফেরার পথে ফ্রান্স। একখানা থার্ড-হ্যান্ড লঝঝড়ে গাড়ি কিনেছিল ইন্সটলমেন্টে। তাতে চেপেই ইউরোপ পরিক্রমা। মিলানে দা-ভিঞ্চির 'শেষ সায়মাশ', ফ্লোরেন্সে মিকেলাঞ্জেলোর 'ডেভিড', 'মোজেস', ভ্যাটিকান সিটিতে সিস্টিন চ্যাপেল সিলিঙ! রোমের আর্ট গ্যালারিতে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা ছবিতে প্রচণ্ড মানসিক ধাক্কা খেল মীগেরেঁ।

1606 খ্রীষ্টাব্দে আঁকা কারাভাগ্গোর : ইম্মায়ুস্-এ যীশু!

কারাভাগ্গো সপ্তদশ শতকের একজন প্রখ্যাত ইতালিয়ান চিত্রকর। তাঁর ছবিতে আলো আর ছায়া অদ্ভুতভাবে মিতালী করে! তাঁর আঁকা ঐ ছবিটায় ও কী দেখল তা বলার আগে লিপিবদ্ধ করতে হয় শিল্পী কী এঁকেছিলেন। হ্যাঁ, শিল্পী যা এঁকেছিলেন, যা বলতে চেয়েছিলেন, তা দেখেনি মীগেরেঁ। কিন্তু সে সব কথা পরে। আপাতত বলি চিত্রপটে কী দেখা যাচ্ছে!

কারাভাগ্গোর ক্যানভাসে দেখা যাচ্ছে—যীসাস্ এবং তাঁর দুজন গুণগ্রাহী বসে আছেন একই ডাইনিং টেবিলে। পশ্চাৎপটে একজন খাদ্য-পরিবেশক এবং একটি পরিচারিকা। মোটমাট পাঁচটি চরিত্র।

কাহিনীর মূল উৎস লুক-কথিত সুসমাচারের কয়েকটি পংক্তি। হোলি বাইবেলে ঐ কয়েকটি ছত্রে সেন্ট বর্ণনা করেছেন প্রভু যীশুর 'রেজারেকশন' বা পুনর্জন্ম-প্রসঙ্গ। যীশু ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ হয়ে মানবহিতার্থে আত্মাহুতি দেবার পরে কেউ কেউ নাকি তাঁকে কায়াময় মূর্তিতে দেখতে পেয়েছিল। সেটাই 'রেজারেকশন'-প্রসঙ্গ। সেন্ট লুক এখানে তেমনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন—ঘটনা



'ইম্মায়ুস্'-এর। ইম্মায়ুস জেরুজেলামে যাবার পথে একটি নগণ্য গণ্ডগ্রাম। সেই জনপদের দিকে যাবার সড়কের ধারে পথপ্রান্তের এক সরাইখানায় যীসাস্কে নাকি দুজন দেখতে পায় এবং চিনতে পারে। তাদের একজনের নাম : ক্লিওপাস। আমি যতদূর জানি—ভুল হলে কোন নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান পাঠক আমাকে দয়া করে শুধরে দেবেন—বাইবেল-এ ঐ নামটি দ্বিতীয়বার উল্লিখিত হয়নি। অর্থাৎ ক্লিওপাস যে প্রভুর শিষ্য এমন কথা জোর করে বলা চলে না। দ্বিতীয়জনের নামোল্লেখ করেননি সেন্ট লুক। তা সে যাই হোক, ওরা দুজনে সরাইখানার একটি টেবিলে বসে আপন মনে নৈশাহার সারছিল। যে রাত্রের ঘটনা, তার কয়েকদিন পূর্বেই ক্রুশকাষ্ঠে যীশুর তিরোধান ঘটেছে। তাঁর নশ্বর দেহ ক্রুশকাষ্ঠ থেকে অবনমিত করে সমাধিস্থ করাও হয়েছে। টেবিলের ও-প্রান্তে নতুন যে আগন্তুক এসে বসেছে তার দিকে চোখ তুলে দেখবার ওদের না ছিল অবকাশ, না বাসনা। পরিচারিকা যখন সেই আগন্তুককে রুটি-মাংস দিয়ে গেল তখন তিনি নিঃশব্দে রুটিটাকে তিন টুকরো করলেন। বান-রুটির এক-তৃতীয়াংশ নিজের প্লেটে তুলে নিয়ে বাকি দুটি অংশ ওদের দুজনের প্লেটে তুলে দিলেন।

ওরা দুজনেই চমকে ওঠে! এ আবার কী! এমনটা তো হয় না। হবার কথা নয়। অজানা, অচেনা দুই সহভোজীকে অযাচিত ভাগ দিয়ে আহার করা! ওরা এতে অভ্যস্ত নয়! তাই দুজনেই অবাক বিস্ময়ে আগন্তুকের দিকে চোখ তুলে তাকালো।

এবং তৎক্ষণাৎ আঁৎকে উঠল ক্লিওপাস!

হ্যাঁ! সেই পাগল লোকটাই! সেই যে লোকটা বলত: 'ল্যভ দাই নেবার!' সিজারের দুনিয়ায় যে পাগলটা প্রলাপ বকত: 'কেউ যদি তোমার এক গালে চড় মারে তাহলে তার দিকে ও-গালটা বাড়িয়ে দিও!'

কিন্তু তা কেমন করে হবে? সে পাগলটা তো সেই প্রলাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে ইতিমধ্যে! পন্তিয়াস্ পীলেতের বিচারে ঐ লোকটাই না সেদিন...

সে কথাই জানতে চাইল ক্লিওপাস—

কিন্তু জানা হল না। ওদের সামনের চেয়ারটায় কেউ নেই! অভুক্ত পান্থের আহার্যপাত্র অস্পর্শিত। উপেক্ষিত বান-রুটিটার ছিন্ন অংশটুকু উবুড় হয়ে পড়ে আছে অভুক্ত প্লেটে।

যীসাস্ অন্তর্ধান করেছেন ইতিমধ্যে!

কারাভাগ্গোর আঁকা সেই বিশ্ববন্দিত তৈলচিত্রটির দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল মন্ত্রমুগ্ধ মীগেরেঁ। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে। পাঁচ-মিনিট, সাত-মিনিট, দশ-মিনিট! শেষে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল জোহানার। স্বামীর দিকে ফিরে তার কানে কানে বললে, কী দেখছ অমন করে? চল—

সম্বিত ফিরে পেল মীগেরেঁ। রুদ্ধস্বরে বললে, তোমার যদি ভালো না লাগে তবে হোটেলে ফিরে যাও। আমি এ ছবিটা দেখব।

ওর কণ্ঠস্বরে অন্যান্য দর্শক ওদের দিকে ফিরে তাকায়। জোহানা একটু অপ্রস্তুত। মীগেরেঁর কর্ণমূলে নিম্নস্বরে বললে, দেখলে তো এতক্ষণ! আর কত দেখবে? গ্যালারির অন্যান্য ছবি... হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে হান—বিরক্ত কর না আমাকে! আমি সারাদিন ধরে এই একখানা ছবিই দেখব! তোমার আপত্তি আছে?

আশপাশের সব কটা চোখ কেন্দ্রীভূত হল দম্পতির দিকে। যেন তারা একটা পাগলকে দেখছে! যেন চিত্রশালায় এমনটা হয় না, হবার কথা নয়! মরমে মরে গেল জোহানা। তার ইচ্ছা

করছিল—চিত্রপটের ঐ উপেক্ষিত বান-রুটির টুকরোটার মত উবুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে।

বেচারি তো জানে না—হান ভাঁ মীগেরেঁ ঐ অনবদ্য ক্যানভাসে মানবত্রাতা যীসাসকে দেখতে পায়নি আদৌ! সে দেখতে পাচ্ছিল—কুইন অব শেবার রত্ন-ভাণ্ডার! টুটেনখামেনের টাকায় টইটম্বুর টুম্ব্!

সোনা-রূপা-হীরে-জহরৎ! কারাভাগ্গোর ছবিখানা ওকে বলছে : চিচিং ফাঁক!

স্বপ্ন দেখছে না মীগেরেঁ! 'চিচিং ফাঁক' মন্ত্রটা সে সত্যই খুঁজে পেল ঐ তৈলচিত্রটিতে। বেয়াল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত যে ভ্যাগাবন্ডটা ছিল নেদারল্যান্ডের একজন উপেক্ষিত, অখ্যাত, অজ্ঞাত, অদ্য-ভক্ষ্য-ধনুর্গুণ শিল্পযশপ্রার্থী অকিঞ্চন, ঐ চিত্রদর্শনের ফলশ্রুতি হিসাবে মাত্র পাঁচ বছর পরে সেই মানুষটাই হয়ে গেল : মিলিওনেয়ার! ধনকুবের!

শিল্পী এঁকেছিলেন : রেজারেকশন—যীসাস্-এর।

দর্শকের অন্তরে হল : রেজারেকশন—সেটান-এর!

— মস্যুঁয়ে মীগেরেঁ আপনি অহেতুক আপনার বন্ধুদের বাঁচাতে চাইছেন। সে চেষ্টা সফল হবার নয়। ওরা বাঁচবে না; মরবেই। আপনি কেন শুধু শুধু ওদের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলছেন?

— কাদের কথা বলছেন, অফিসার? —মীগেরেঁর মস্তিষ্কে আর ঠিকমতো কাজ করছে না। তার ক্রমে ক্রমে সব ভুল হয়ে যাচ্ছে।

— ঐ ডক্টর ওয়াল্টার হোফার আর মস্যুয়ে ভাঁ স্ত্রিভেসান্দে।

— তাঁরা কারা? ...ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ওরা আমস্টার্ডামের দুজন নামকরা আর্ট-ডীলার! আমার কম্পিটিটার। আপনি সেই 'অ্যাডালটারেস্' ছবিখানার কথা বলছেন, না? ভেরমিয়ারের সেই অনবদ্য মাস্টারপিস্! কিন্তু বিশ্বাস করুন অফিসার, ওদের দুজনের মধ্যে কাউকেই আমি সেই 'অ্যাডালটারেস্' ছবিখানা বেচিনি!

— বিশ্বাস করলাম। তা তো হতেই পারে। তাহলে বলুন—কাকে বেচেছিলেন?

— মিল্ডকে। রটার্ডামের আর্ট-কলেক্টর জন মিল্ডকে। সেটা বেয়াল্লিশ সালের কথা। তখনো কিন্তু ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিঙ নেদারল্যান্ডে আসেনি।

— মেনে নিলাম। তা তো হতেই পারে। এবার বলুন কোথায় পেয়েছিলেন ছবিখানা?

— আমার...আমার এক বান্ধবীর কাছে। ইতালিয়ান মহিলা...কিন্তু তাঁর নামটা আমি আপনাদের জানাতে পারব না—

— কেন? কেন জানাতে পারবেন না?

— নামটা জানাজানি হয়ে গেলে সে মেয়েটির সর্বনাশ হয়ে যাবে যে! মিলানে তার স্বামী আছে, সন্তান আছে...

— আপনি ভুল করছেন মস্যুয়ে মীগেরেঁ। এটা উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের জুন মাস। বিশ্বযুদ্ধ বহুদিন হল থেমে গেছে। ইতালীর শাসক ফাসিস্ত বেনিতো মুসোলিনীর মৃত্যু হয়েছে। এখন আর মাদাম মাভ্রোখ্-এর স্বামী বা সন্তানের কোন ভয় নেই মিলানে।

মীগেরেঁ স্তম্ভিত হয়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে, কী বললেন? মাভ্রোখ্?

— হ্যাঁ, মাদাম মাভ্রোখ্। এই নামটাই তো গোপন করবার কথা বলছিলেন তখন, তাই নয়?



— তবে তো....আপনারা সবই জানেন?

— না, সবটা জানি না। কিছু কিছু জানি। যেমন জানি, আপনি গোয়েরিঙকে কোনও ছবি বিক্রি করেননি, যেমন জানি আপনি ঐ দুষ্টচক্রের অংশীদার নন। কিন্তু না, সব কথা আমার জানি না! এখন বলুন, মস্যুয়ে মীগেরেঁ—ঐ মাভ্রোখ্ এখন কোথায় আছে?

— আমি জানি না, বিশ্বাস করুন...আমি সত্যিই জানি না।

— বিশ্বাস করলাম। তা তো হতেই পারে। এখন এই যুদ্ধান্তের দুনিয়ায় সে বেঁচে আছে কি না তাই হয়তো জানেন না আপনি। কিন্তু উনিশ'শ আটত্রিশ সালে, মানে সেই যেদিন মাভ্রোখ্ আপনার 'প্রিমেভেরায়' ঐ ছবিখানা লুকিয়ে এনে দিয়েছিল তখন সে কোথায় থাকত? তখন তার স্বামী মিলানের কোন্ ঠিকানায় থাকত?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মীগেরেঁ। বলে, কেন অহেতুক তাহলে হয়রানি করছেন আমাকে? আপনারা তো জানেনই কীভাবে, কোথা থেকে ঐ 'অ্যাডালটারেস্' ছবিখানা আমার হাতে এসেছিল। স্থান-কাল-পাত্র সবই তো জানেন...

— না, সব কিছু জানি না। মাভ্রোখের নামটুকুই জানি। তার পুরো পরিচয়টা জানি না। আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারছি না—সেই মেয়েটি ফাসিস্ট স্পাই ছিল কি না।

— আমি আপনাকে নিশ্চিন্ত করছি অফিসার, মাভ্রোখ্ স্পাই ছিল না।

— কী করে জানলেন? আপনি নিশ্চিত?

— হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। কী করে জানলাম সে কথা অবশ্য বলতে পারব না।

- বুঝেছি। আপনার যুক্তি হচ্ছে—মাভ্রোখ্ স্পাই হতে পারে না, যেহেতু সে ছিল আপনার গোপন প্রণয়িনী। জোহানার সজাগ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে-যে-হেতু সে রাতের পর রাত আপনার 'প্রিমেভেরা' প্রমোদকুঞ্জে কাটিয়ে গেছে?

মীগেরেঁ তার প্লাটিনাম-ব্লন্ড সাদাচুলের গোছা দু-হাতে খামচে ধরে বললে, না! তা নয়! অফিসার! সব কথা আপনাকে খুলে বলতে পারব না, বলব না। সত্যিকথা বলতে কি, সব কথা আমি নিজেও জানি না। আমার কাছেও অনেকখানি হেঁয়ালিই রয়ে গেছে। কিন্তু এটুকু আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, মাভ্রোখ্ কোনও ফাসিস্ট স্পাইয়ের নাম নয়—

— কোন যুক্তিতে? কেন—তা আপনি এখনো বলেননি।

পুলিস-অফিসারের চোখে চোখ রেখে এবার বললে, যেহেতু 'মাভ্রোখ্' নামটা অলীক! ও নামে বাস্তবে কেউ কোনদিন ছিল না। নামটা আমার বানানো—

— অথচ ডক্টর বুনকে উনত্রিশে আগস্ট উনিশ'শ সাঁইত্রিশ সালে বলেছিলেন যে, মাভ্রোখ্ একটি ইতালিয়ান সুন্দরী। তার স্বামী মিলানে থাকে। সে গোপনে সীমান্ত পার হয়ে ফ্রান্সে এসেছিল একখানা ভেরমিয়ার বিক্রি করতে? বলেননি?

— সাল-তারিখ মনে নেই, তবে ঐ-কথা একদিন আমি ডক্টর বুনকে বলেছিলাম স্বীকার করছি—

— এবং তাঁকে এ-কথাও বলেছিলেন যে, মাভ্রোখ্ আপনার গুপ্ত প্রণয়িনী।

— লুক হিয়ার অফিসার, হ্যাঁ তাও স্বীকার করছি—বলেছিলাম। কিন্তু সে-সব মিথ্যা কথা। আদ্যন্ত মিথ্যা! মাভ্রোখ্ স্পাই নয়, ও নামটা অলীক!

— তবে কী নাম মেয়েটির?

— কী আশ্চর্য! সমস্ত ব্যাপারটাই অলীক। ও-ভাবে কোন মেয়ে 'ক্রাইস্ট অ্যাট ইম্মায়ূস'

আমাকে এনে দেয়নি।

— বেশ, তর্কের খাতিরে না হয় ধরে নেওয়া গেল— কোন মেয়ে ছবিখানা আপনাকে এনে দেয়নি। শুধু মাভরোখ্ নামটুকু নয়, ইতালিয়ান মেয়েটিই অলীক। কিন্তু ছবিখানা তো অলীক নয়? ভেরমিয়ারের সেই ষোল লক্ষ গিল্ডার্স দামের 'ক্রাইস্ট অ্যাট ইম্মায়ুস' ছবিখানা? ডক্টর বুনও অলীক চরিত্র নয়। আপনি তাঁকে ছবিখানা বিক্রয় করেছিলেন এটাও প্রতিষ্ঠিত সত্য আপনি মেনে নিচ্ছেন! এবার তাহলে বলুন কোথায় পেয়েছিলেন সেই ছবিখানা।

হান ভাঁ মীগরেঁ নিষ্পলকনেত্রে তাকিয়ে থাকে তদন্তকারী অফিসারের দিকে। অফিসারটি এবার বলে ওঠে, সুতরাং নতুনভাবে জটিলতার সৃষ্টি করবেন না। মাভ্রোখ্কে অলীক বলে, আপনার খেয়ালী মনের কল্পনা বলে উড়িয়ে দিলে আপনাকে নতুন করে কৈফিয়ৎ দিতে হবে কোন্ ভূগর্ভস্থ গুপ্ত সংগ্রহশালা থেকে কেমন করে আপনি সেই ভেরমিয়ারখানা উদ্ধার করেছেন!

এবারেও মীগরেঁ কোন জবাব দিল না। নত নেত্রে কী-যেন সাপের মন্ত্র আওড়াতে থাকে বিড় বিড় করে। ইন্টারোগেটিং অফিসার নড়ে-চড়ে বসে। এই লক্ষণটা ভয়াবহ—ঐ নীরবতা আর সাপের মন্তর আওড়ানো। হাজতী-আসামীকে দিয়ে ক্রমাগত কথা বলাতে হয়। শম্বুকবৃত্তি নিলেই সর্বনাশ। তাই তাড়াতাড়ি অন্য দিক থেকে শুরু করে আবার, মস্যুয়ে মীগরেঁ! আমি বিশ্বাস করেছি, এতদিন পরে সব কথা আপনার ঠিক মনে পড়ছে না। তা তো হতেই পারে। আপনি তো জাত-ক্রিমিনাল নন। সাদা-সিধে ভালোমানুষ। শিল্পী! চিত্রকর! ছবি আঁকেন, ছবির কেনাবেচা করেন। পুলিসের কাছে জবানবন্দি দেবার প্রশ্নই ওঠেনি আপনার দীর্ঘ জীবনে। আচ্ছা, বলুন তো—দক্ষিণ ফ্রান্সে রোকেব্রুন শহরের সেই বাড়িটার কথা আপনার মনে আছে? সেই 'প্রিমেভেরা'?

হঠাৎ খুশিয়াল হয়ে উঠল বন্দী। বললে,থাকবে না? যেন 'কন্সটেব্‌ল্'-এর আঁকা একখানা ছবি!

— ঠিক সমুদ্রের ধারে, নয়? অসংখ্য সী-গাল উড়ত আকাশে, আর দিবারাত্র সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ত বিস্তীর্ণ বালুতটে। তাই নয়?

মীগরেঁ দু-চোখ বুজে স্মৃতির ক্যানভাসে বাড়িখানা দেখতে থাকে। রোকেব্রুন শহরের সেই 'প্রিমেভেরা'!

— আপনি ঐ বাড়িতে ছয় বৎসর একা ভাড়া ছিলেন। তাই নয়? উনিশ শ বত্রিশ থেকে আটত্রিশ ! মনে পড়েছে?

— সাল-তারিখ মনে নেই। তবে দীর্ঘদিন ঐ বাড়িটায় আমি একা থাকতাম। বছর-পাঁচ ছয় হবে।

— ঐ বাড়ি থেকে আধ-কিলোমিটার দূরে একটা হোটেল ছিল। মনে পড়ে? তার নাম 'লা ম্যাগ্‌নিফিক্'!

— হ্যাঁ! রোমানেস্ক-স্থাপত্যের সঙ্গে গথিক-স্থাপত্যের এক জগা খিচুড়ি! রোকব্রুনে ঐ একটাই তো হোটেল। বাদবাকি পেইং-গেস্ট-এর ব্যবস্থা।

— এবার আপনাকে জানাচ্ছি, সেই হোটেল রেজিস্টারে আমরা দেখেছি 'মাভ্‌রোখ্' নামে একটি মহিলা এসে উঠেছিল। একা। আর তার আদি নিবাস হিসাবে রেজিস্টারে লিখেছিল 'মিলান, ইতালী'। এ আমি নিজে চোখে দেখেছি। তা থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, 'মাভ্‌রোখ্' নামটা



অলীক নয়? ঐ নামে একটি রক্ত-মাংসের জীব বাস্তবিক ছিল?

মীগরেঁ অনেকক্ষণ কী ভাবল। তারপর বললে, না, তাতেও সে কথা প্রমাণ হয় না। এটাই প্রমাণ হয় কোন একটি মেয়ে ঐ ছদ্মনামে হোটেলে উঠেছিল।

— সে কেন ছদ্মনাম নেবে?

— আমি তা কেমন করে জানব? হয়তো সে ইতালী থেকে কাউকে ব্ল্যাকমেলিং করতে এসেছিল!

— মানলাম। তার মানে আপনার অতীত জীবনে এমন কিছু ছিল যাতে একটি ভিনদেশী মেয়ে—সে বাস্তবে মাভ্‌রোখ্ হোক-বা-না-হোক—আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করতে এসেছিল! তাহলে বলুন—কী সেই অতীত জীবনের নেপথ্য ইতিহাসটা?

মীগরেঁ রুখে ওঠে—আপনার চার্জটা কী মশাই? কোন্ ধারায় আমাকে অভিযুক্ত করতে চান, আগে তাই বলুন দেখি! গোয়েরিঙ্কে ছবি বেচা, না আর কিছু?

— আমি যদি এখন বলি : ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জ?

— মার্ডার! খুন! বাঃ! কে খুন হল? তার মৃতদেহটা কোথায়?

— এবার আমি যদি বলি—মৃতদেহটা আপনি খণ্ড খণ্ড করে ঐ প্রিমেভেরাতেই পুড়িয়ে ফেলেছেন? যে খুন হল তার নাম : মাভ্‌রোখ্? সে ইতালিয়ান!

মীগরেঁ জবাব দিতে পারে না। জ্বলন্তদৃষ্টিতে সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে । না, জ্বলন্ত দৃষ্টি নয়, এবার যেন পাগলের দৃষ্টি। অথবা দিশেহারা নাবিকের। ঝড়ের রাত্রে জাহাজটা যখন উথাল-পাথাল করছে তখন জাহাজের ক্যাপ্টেন যদি হঠাৎ আবিষ্কার করে বসে যে, তার কম্পাসটাও খোয়া গেছে—তখন তার দৃষ্টি যে রকমটা হয়!

— বলুন মস্যুয়ে মীগরেঁ! রীতিমত সার্চ-ওয়ারেন্ট নিয়ে ফ্রেঞ্চ পুলিস কি একদিন আপনার বাড়িটা—ঐ প্রিমেভেরায় খানা-তল্লাসী করেনি? হোটেল থেকে ঐ মেয়েটি বেমক্কা নিরুদ্দেশ হবার পর? আপনার প্রতিবেশীরা কি অভিযোগ করেনি যে, 'প্রিমেভেরা'-র চিম্‌নি দিয়ে ক্রমাগত ধোঁওয়া বার হত? দুর্গন্ধযুক্ত ধূম? এমনকি মধ্যরাত্রেও? যখন আপনি প্রত্যাশিতভাবে নিদ্রিত?

অনেক কষ্টে মীগরেঁ বাকশক্তি ফিরে পায়। বলে হ্যাঁ, পুলিসে সার্চ করেছিল। আমার ছবি, ক্যানভাস, জিনিসপত্র সব তছনচ করেছিল। কিছুই পায়নি। কোন সূত্রই নয়! মাভ্‌রোখ্ নামে কেউ কোনদিন ছিল না। তার খুন হবার প্রশ্নই ওঠে না।

— মাভ্‌রোখ্ নামটা অলীক হতে পারে। মেয়েটার নাম হয়তো ছিল জিল।

— জিল্? জিল্ কে? আমি চিনি না, আমি জানি না!

— আই সী! আচ্ছা জিল্কে না চিনলেও জ্যাক মীগরেঁকে তো চেনেন? বৃদ্ধ অনেক কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করে বললেন, জ্যাক আমার একমাত্র পুত্র!

— সে এখন কোথায়?

চীৎকার করে ওঠে বন্দী—ড্যাম ইট! ন্যাকা সাজছেন! আপনি জানেন না যে—সে ডাচ ইস্ট-ইন্ডিজে মারা গেছে।

— জানি। আমি জানি। আমি শুধু জানতে চাইছি—আপনি কতটা জানেন। এবার বলুন তো জ্যাক মীগরেঁ কীভাবে মারা যায়?

এবার অতি শান্তস্বরে সে জবাব দিল। কে বলবে পূর্ব প্রশ্নটার জবাব সে দিয়েছিল চীৎকার

করে। এবার বললে, অফিসার! এ কী শুরু করেছেন আপনি? জ্যাকের প্রসঙ্গ কেন তুলছেন? তাকে শেষবার যখন দেখি তখনো সে নিতান্ত বালক! তারপর তার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। আপনি তা নিশ্চয় ভালভাবে জানেন। তা হোক, তবু সে আমার সন্তান! আমার পুত্র! আপনার কি সন্তান নেই? আপনার একমাত্র পুত্রটি যদি ফায়ারিঙ স্কোয়াড-এর সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ করে থাকে তাহলে সে দুঃস্বপ্নের কথা কি আপনি ভুলে যেতে চাইবেন না?

— 'জিল্' মীগেরেঁ হচ্ছে সেই বিদ্রোহী জ্যাকের প্রণয়িনী। সম্ভবত তার স্ত্রী! তার সঙ্গে আপনার কোন যোগাযোগ নেই বলতে চান?

— না, নেই! আমি জিল্‌কে চিনি না, কোনদিন দেখিনি। কোন পত্রালাপও করিনি! এই মুহূর্তে জানলাম তার অস্তিত্বের কথা! আমার পুত্র যে বিবাহ করেছিল তাও জানতাম না আমি।

— মিছে কথা বলছেন এবার! আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, জিল্ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ—হঠাৎ ধৈর্য হারালো বন্দীর। চীৎকার উঠ্‌ল, গেট আউট! আই সে গেট আউট! তোমার কোনও প্রশ্নের জবাব আমি দেব না! আমার বিরুদ্ধে তোমাদের চার্জটা কী আগে তাই বল। তারপর আমার সলিসিটারকে সামনে রেখে আমি তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেব। নাউ ক্লিয়ার আউট।

— মস্যুয়ে মীগেরেঁ! আপনি ধৈর্য হারাবেন না। আমারও পুত্রসন্তান আছে। তার বয়সও ঐ জ্যাকের মতো! আমি বুঝতে পারছি আপনার কী-রকম কষ্ট হচ্ছে! যদি আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকি...

— ক্লিয়ার আউট! য়ু বাস্টার্ড!

— প্লীজ মস্যুয়ে মীগেরেঁ...

— ক্লিয়ার আউট! য়ু বাস্টার্ড! তোর্ মতো বেজন্মার সঙ্গে আমি কোন কথা বলব না! গেট আউট!

## ।। চার ।।

ফিগারো সম্পাদকের বৈঠকে কনফারেন্স শেষ হল। খাতাপত্র ফাইল গুছিয়ে নিয়ে সবাই কক্ষত্যাগের উপক্রম করছে। সম্পাদক ডক্টর নিকোলাস লে লোরেন বললেন, পয়ঁক্যারে, তুমি একটু অপেক্ষা কর। কথা আছে তোমার সঙ্গে।

ইউজিন পঁয়ক্যারে চোখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখল। উঠে দাঁড়িয়েছিল সে, এ-কথায় বসে পড়ে। পঁয়ক্যারের বয়স ত্রিশের কোঠায়। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। ফিগারো পত্রিকার একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। ইতিপূর্বে ছিল ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগে। প্রাকযুদ্ধ আমলে। সুতরাং গোয়েন্দা-সুলভ সব কয়টি গুণই আছে তার। পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগে তার বহু অন্তরঙ্গ বন্ধু। ফিগারোতে বার-তিনেক আলোড়নকারী 'রিপোর্তাজ' দাখিল করেছে—যাতে শুধু পারী বা ফ্রান্স নয়, গোটা ইউরোপ চমকে উঠেছিল। যুদ্ধ চলাকালে সে ছিল আমস্টার্ডামে। এখনো সেখানকার আঞ্চলিক সংবাদদাতা। নাৎসী অধিকারকালে সেখানেই গৃহবন্দী ছিল।

ঘর খালি হবার পর বৃদ্ধ লে-লোরেন ওর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার বল তো পঁয়ক্যারে, কেন তুমি আমার এই 'অপারেশন মীগরেঁ'কে বর্জন করতে চাইছ?

পঁয়কারে ম্লান হেসে বললে হেতুটা জানতে চাইবেন না, স্যার। আমার সাজেসশান—আপনি আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকেই এই দায়িত্ব দিন। হয় আমাকে, নয় অ্যাগনেস্‌কে।

— কেন? কেন নয় দুজনকেই যৌথভাবে? সেটাই তো জানতে চাইছি আমি।

— স্যার! আপনাকে বেছে নিতে হবে। বেছে নিন—প্রশ্নটা হয় শিল্প সম্বন্ধীয়, নয় রাজনৈতিক। যদি প্রথমটা হয়—তাহলে অ্যাগনেস্ যাবে আমস্টার্ডামে; সে খুঁজে দেখুক রহস্যটা কী। আর যদি মনে করেন রহস্যজাল ভেদ করতে রাজনৈতিক গোয়েন্দাগিরির প্রয়োজন তাহলে অ্যাগনেস্ যাবে না, দায়িত্বটা আমিই গ্রহণ করব।

— বাট হোয়াই, হোয়াই? কেন নয় দুজনে একসঙ্গে? যৌথ দায়িত্ব নিয়ে? আমি এখনো বুঝে উঠ্‌তে পারছি না, রহস্যটা কী জাতীয়? এটা তো বুঝছ? প্রশ্ন হচ্ছে একটা—মীগেরেঁ যুদ্ধের কয়েক বছরে কপর্দকহীন থেকে কোটিপতি হয়েছে। কী করে, তা আমরা জানি না। সম্ভবত সে একটি গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে—লোকচক্ষুর অন্তরালের এক ল্যুভ মিউজিয়াম! সেটাই খুঁজে বার করতে চাইছি আমরা। রহস্যটা শিল্প-সম্বন্ধীয় তো বটেই কিন্তু তিন-চারটি রাষ্ট্রের নাম ইতিমধ্যেই যুক্ত হয়ে গেছে রহস্যটার সঙ্গে। নেদারল্যান্ডস্, ফ্রান্স, জার্মানী আর ইতালী! ফলে তোমাকেও চাই। এখন বল—দুজনে একত্রে কাজ করার অসুবিধাটা কোথায়? বিশেষ, তুমি আমস্টার্ডামের বাসিন্দা।

পঁয়কারে টেবিলের উপর কাগজ-চাপাটাকে নিয়ে অহেতুক নাড়াচাড়া করছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললে, সত্যি কথাটা স্বীকার করতে সাংবাদিকের এথিক্সে বাধছে স্যার!

— সাংবাদিকের এথিক্স? তোমার বিবেক! কী ব্যাপার?

— বস্-এর কাছে সহকর্মীর বিরুদ্ধে কিছু বলাকে প্রাকৃতভাষায় বলে: 'চুগলিকাটা'!

— আই সী! অ্যাগনেসের বিষয়ে...?

— আপনি অভিজ্ঞ সাংবাদিক। আমাকে দিয়ে স্বীকৃতি নাই বা করালেন?

বৃদ্ধ একটি সিগারেট বার করে ধরালেন। দেশলাই কাঠিটাকে সম্পূর্ণ জ্বলতে দিলেন। তারপর সেটাকে অ্যাশ-ট্রের গর্ভে নিক্ষেপ করে বললেন, পঁয়ক্যারে! যেদিন তোমাকে ব্যাপটাইজ করা হয় তার আগেই আমি ফিগারোর সম্পাদক হয়েছি। এ দুনিয়ায় দেখতে এবং জানতে আমার কিছু বাকি নেই। অনেক অনেক-অনেক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির গোপন কথা আমার মগজের গ্রে-সেলে থরে থরে সাজানো। চার্চিল থেকে ট্রুম্যান, হল্যান্ডের বৃদ্ধা রাজমাতা ডাওয়েজার কুইন উইল্‌হেলমীনা থেকে তাঁর যৌবনবতী কন্যা জুলিয়ানা পর্যন্ত সবাই। স্তালিন, পেতাঁ, দ্য গল কেউ বাদ যাবেন না। তার সঙ্গে তোমার সহকর্মী মাদাম অ্যাগনেস্ শ্যাম্পেন সম্বন্ধে কোন গোপন কথা যদি আমার গোচরে আসে তাতে বাইবেল অশুদ্ধ হবে না। সম্পাদক হিসাবে সব কয়টি কর্মচারীর সবরকম 'লুপহোল' সম্বন্ধে আমার অবহিত থাকাই ভাল। তাতে শুধু ফিগারো নয়, তাদেরও মঙ্গল। তুমি যা জান, খুলে বল দিকিন?

পঁয়ক্যারে মনস্থির করে। বলে, অল রাইট স্যার! সব কথাই খুলে বলব আমি। আপনি ঠিকই বলেছেন। ফিগারোর সম্পাদকের পক্ষে প্রত্যেকটি কর্মীর প্রত্যেকটি 'লুপহোল' সম্বন্ধে অবহিত থাকা মঙ্গলের। কিন্তু তার পূর্বে আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিন তো। আমি ডক্টর বার্নিনীর কাছে শুনেছি কিছুদিন আগে অ্যাগনেস্ আপনাকে হান ভাঁ মীগরেঁর জীবনীটা সংক্ষেপে জানিয়েছিল। তাই নয়?

— হ্যাঁ, বলেছিল। সে-কথা কেন?

— ও কি হান জ্যাক মীগেরেঁর কথা কিছু বলেছে?
— হান জ্যাক মীগেরেঁ ? সে কে?
— অঁরিকুস হান ভাঁ মীগেরেঁর একমাত্র পুত্র। মীগেরেঁ দুবার বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর নাম অ্যানা। তাঁর দুটি সন্তান হয়। পুত্রটির নাম জ্যাক ; কন্যাটির নাম ঈনেভ। দ্বিতীয়া স্ত্রী জোহানার কোন সন্তানাদি হয়নি। জোহানার সঙ্গে ওঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল 1916 সালে. তাঁর একক প্রদর্শনীতে। জোহানা ওয়েলমান্স ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মঞ্চ শিল্পী। সুন্দরী, গ্ল্যামারাস, লাস্যময়ী। কিন্তু তিনি ছিলেন বিবাহিতা। তাঁর স্বামী ডক্টর ক্যারেল ডি বোয়ের একজন শিল্পসমালোচক। মীগেরেঁর স্ত্রীর আমন্ত্রণ পেয়ে ডক্টর বোয়ের সস্ত্রীক প্রদর্শনী দেখতে আসেন। তারপর থেকে জোহানা বস্তুত ছিল মীগেরেঁর গুপ্ত প্রণয়িনী। 1924-এ অ্যানা দ্য ভুংকে ডিভোর্স করার পাঁচ বছর পরে মীগেরেঁ জোহানাকে বিবাহ করে। সেই সময়ে ওর প্রথমা স্ত্রী পুত্র-কন্যা সমেত ইস্ট-ইন্ডিজে চলে যায়।
— এসব কথা মোটামুটি শুনেছি অ্যাগনেসের কাছে। তারপর?
— অ্যানা প্রথমে যায় সুমাত্রাতে । পরে ডাচ-সরকার পরিচালিত একটি স্কুলে চাকরি পেয়ে চলে আসে ব্যাটাভিয়ায় (বর্তমানে নাম জার্কার্তা), অর্থাৎ জাভা দ্বীপে। ঈনেভকে ভর্তি করে দেয় একটি অবৈতনিক মিশনারী স্কুলে। ছেলেটি ততদিনে স্কুল লীভিং সার্টিফিকেট পেয়েছে। মায়ের প্রচেষ্টায় জ্যাক চাকরি পায় ব্যাটাভিয়ার সেক্রেটারিয়েটে। গোয়েন্দার চাকরি। পুলিস বিভাগে। কিন্তু ছেলেটার মাথায় ছিল দুষ্ট বুদ্ধি। কী জানি কী করে সে ইন্দোনেশিয়ান ন্যাশনালিস্ট পার্টির খপ্পরে পড়ে। আপনি জানেন, আহমেদ সুকর্ণো আর মহম্মদ হাত্তা 1927 সালে ঐ রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ অ্যানা ইস্ট-ইন্ডিজে পৌঁছানোর বছর কয়েক পরে। ইতিমধ্যে ডাচ-সরকার ঐ রাজনৈতিক দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। দলের দুই কর্ণধার সুকর্ণো আর হাত্তা তখন জেলে বন্দী। কিন্তু পার্টি যথারীতি আন্ডারগ্রাউন্ড কাজ করে যাচ্ছিল। ঐ ছোকরা—জ্যাক—পঞ্চম বাহিনীর কাজে মাথা গলায়। কিন্তু ডাচ কলোনিয়াল সরকারের ইন্টেলিজেন্স বিভাগ জ্যাক-ছোকরাকে ধরে ফেলে। জ্যাক মীগেরেঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে সে তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করে যায়। ওর বোন ঈনেভ মিশনারী স্কুল থেকে একটি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। আর অ্যানা পুত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে।
বৃদ্ধ অ্যাশট্রেতে ছাইটা ঝেড়ে ফেলে বলেন, শুনলাম। এর মধ্যে অ্যাগনেসের প্রসঙ্গ কোথায়?
— সেটা এবার বলব। জ্যাকের মৃত্যু হয়েছিল উনিশ শ ছত্রিশ সালে। তার বয়স তখন তেইশ-চব্বিশ। পাঁচ বছর ব্যাটাভিয়ার গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করার পর। এই পাঁচ বছরে সে সরকারী দপ্তর থেকে অনেক গোপন নথীপত্র সরিয়ে ফেলে, কিছুর ফটো কপি বানায়। বস্তুত সে একটি রীতিমত ফাইল তৈরী করে ফেলে—মারাত্মক ফাইল! সেই ফাইলের কাগজপত্র নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে সক্ষম যে, ডাচ-শাসকেরা ইস্ট-ইন্ডিজের নিগারগুলোর উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে। আপনি তো জানেনই স্যার—এইসব কলোনিয়াল শাসনে পুলিসকে কিছুটা নির্দয় হতেই হয়—নাহলে নিগারগুলোকে তাঁবে রাখা যায় না। কিন্তু দুনিয়ার ফ্রি-প্রেস সেইসব 'মাস-রেপিং' বা 'জেনোসাইড'কে বরদাস্ত করতে চায় না। জ্যাকের ঠিক কী উদ্দেশ্য ছিল জানি না, কিন্তু সে খুব নিখুঁতভাবে অকাট্য তথ্য সংগ্রহ করে গেছে সরকারী দলিল-দস্তাবেজ থেকে। ডাচ-ইন্টেলিজেন্স ওর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দ্বিমত। এক দলের ধারণা—যেকোন কারণেই হোক জ্যাক ঐ নিগারগুলোর স্বাধীনতা-সংগ্রামে মদৎ যোগাতে চেয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল ঐ ফাইলটা নিয়ে সে জাপান অথবা আমেরিকায় পালিয়ে যাবে। সেখান থেকে ঐসব দলিল-দস্তাবেজ সমেত প্রবন্ধ লিখে সে ডাচ-সরকারকে বেইজ্জৎ করবে—বিশ্বকে জানিয়ে দেবে ডাচ-শাসকেরা কী জাতের অত্যাচার চালাচ্ছে। অপর দলের ধারণা—জ্যাক বিদেশ থেকে ডাচ-সরকারকে চাপ দিত! প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সে ঐসব কাগজ ফেরত দিত। কোন্ তথ্যটা সঠিক, জানি না। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, জ্যাক ধরা পড়লেও সেই মারাত্মক ফাইলখানা তার হেপাজতে পাওয়া যায়নি! লোকে বলে, এজন্যই নাকি অ্যানার উপর অকথ্য অত্যাচার হয়, আর তাতেই সে মারা যায়। আত্মহত্যার ব্যাপারটা সরকারী প্রচার! আর ঐ একই কারণে জ্যাকের বোন ঈনেভ ব্যাটাভিয়া থেকে পালায়। ইলোপ-টিলোপ বাজে কথা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জ্যাক আদৌ ফায়ারিঙ স্কোয়াডের-এর সামনে দাঁড়ায়নি। ঐ ফাইলটা উদ্ধারের জন্য পুলিস যে অত্যাচার চালায় তাতেই হঠাৎ সে বেমক্কা মারা যায়।
বৃদ্ধ শুধু মনে করিয়ে দেন, তুমি কিন্তু অ্যাগনেস্ প্রসঙ্গে এখনো আসনি, পঁয়ক্যারে!
— জানি স্যার। এবার বলব। আমার খবর-জ্যাকের দলে যে চার-পাঁচটি গুপ্তসদস্য ছিল তার মধ্যে ছিল একটি তরুণী। জ্যাকের চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। বাস্তবে সে ছিল জ্যাকের প্রণয়িনী, হয়তো বা স্ত্রীই। কারণ পুলিসের সূত্র অনুযায়ী ওরা দুজনে জাভা-সুমাত্রার বিভিন্ন হোটেলে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে একই ঘরে রাত্রিবাস করেছে। মেয়েটার পিতৃদত্ত নামটা যে কী, তা জানা যায়নি। গুপ্তচর দলে তার নাম ছিল : 'জিল'। হয়তো 'জ্যাক অ্যান্ড জিল' ছড়া থেকেই ঐ নামের সূত্রপাত । মোটকথা সেটা ওর ছদ্মনাম। জ্যাকের দলের প্রত্যেকটি সদস্যই একে-একে ধরা পড়ে। জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাভা-সুমাত্রা দখল করার আগেই। শুধু 'জিল'কে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর পাওয়া যায়নি সেই মারাত্মক ফাইলটা!
বৃদ্ধ ছাইদানীতে সিগারের দগ্ধাবশেষটা ফেলে দিয়ে বললেন, বুঝলাম! কিন্তু অ্যাগনেসই যে সেই জিল—এমন অনুমান করার সপক্ষে তোমার কী যুক্তি?
— মাদাম অ্যাগনেস্ শ্যাম্পেনের পূর্ব-ইতিহাস আপনি কতটুকু জানেন স্যার?
— অ্যাগনেসের বাল্যকাল কেটেছে ডাচ্ ইস্ট-ইন্ডিজে। ব্যাটাভিয়া না সুরাভিয়া ঠিক জানি না। সেখানকার কলেজ থেকে সাংবাদিকতার ডিগ্রি নেয়। ডাচ-পাসপোর্টে চলে আসে ফ্রান্সে। পারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতাতেই পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পায়। ঐ সঙ্গে 'ফাইন-আর্টস্' বিষয়ে কী একটা ডিপ্লোমা। মডার্ন ডাচ-পেইন্টার্সদের উপর গবেষণা করবার জন্য একটা স্কলারশিপ পায়। এই সময়েই পারীতে ডক্টর শ্যাম্পেনের সঙ্গে পরিচয় ও প্রণয় হয়। ডক্টর শ্যাম্পেন মেডিক্যাল ম্যান। কিছুদিন কোর্টশিপের পর দুজনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। অ্যাগনেস্ অতঃপর ফ্রেঞ্চ সিটিজেনশিপ গ্রহণ করে, বিবাহসূত্রে। দুজনে সুইজারল্যান্ডে হনিমুনে যায়। ফিরে এসে অ্যাগনেস্ শুরু করে তার রিসার্চের কাজ আর তার স্বামী প্রাইভেট প্র্যাকটিস। ঐ সময়েই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় অ্যাগনেস্ গবেষণা শেষ করতে পারে না। সে ফিগারোতে একটি কর্মসংস্থান করে নেয়। তেতাল্লিশ সালে পারীর রাস্তার যুদ্ধে ডক্টর শ্যাম্পেন শহীদ হন। অ্যাগনেস্ তার ফ্ল্যাটে এখন একাই থাকে—
— মিসেস্ অ্যাগনেস্ শ্যাম্পেনের 'মেইডেন' নাম কী? তার পিতৃপরিচয়?

— হ্যাঁ, সেটাও জানি। ওর মা আর বাবার বিবাহ হয়নি। বলতে পার সে হিসাবে সে লেঅনার্দো দ্য-ভিঞ্চির মতো—বাস্টার্ড! ওর বাপ ছিল কলোনিয়াল ডাচ, মা একজন মুস্‌লিম মহিলা। ডাচ্‌-ইস্ট-ইন্ডিজের একটি অভিজাত পরিবারের মেয়ে। তাঁর কী পদবী ছিল তা অবশ্য জানি না। অ্যাগনেস্‌ ব্যাটাভিয়া থেকে চলে আসার আগেই ওর মায়ের মৃত্যু হয়। বাপকে সে তো কোনদিন চোখেই দেখেনি। সে যাই হোক,তুমি এখনো পর্যন্ত এমন কিছু বল্‌তে পারনি যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, জ্যাক মীগেরেঁর প্রণয়িনী অথবা স্ত্রী 'জিল' আর 'অ্যাগনেস্‌ শ্যাম্পেন' একই ব্যক্তি।

— এবার সেই কথাই বলছি। পুলিসের হিসাব মতো জিল ছিল জ্যাকের চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। তার মানে, অঙ্কের হিসাব মতো জিল-এর বর্তমান বয়স উনত্রিশ। অ্যাগনেসেরও তাই। সেটা অবশ্য কোন প্রমাণ নয়। বরং বলা যেতে পারে—বয়সের পার্থক্য দেখিয়ে ঐ সম্ভাবনাকে অ-প্রমাণ করা যায় না। দ্বিতীয় কথা—পাসপোর্টের এনডোর্সমেন্ট-মোতাবেক অ্যাগনেস্‌ ডাচ ইস্ট-ইন্ডিস্‌ থেকে ফ্রান্সে এসে মার্সেল্‌স্‌ বন্দরে নামে সতেরই ডিসেম্বর 1936 ; লক্ষণীয়—তারিখটা জিল-এর অন্তর্ধানের তিন মাস পরে। যে সময়টা সচরাচর লাগে ঐ জাহাজের। সেটাও অবশ্য কোন প্রমাণ নয়। তৃতীয়ত, অ্যাগনেস্‌ বাঁ-হাতে লেখে। পুলিসের তথ্য অনুসারে জিল ছিল 'লেফ্‌ট-হ্যান্ডার'। চতুর্থত,ডাচ-ইন্টেলিজেন্স সূত্রে জানা যায়—জিল-এর ডান হাতে কব্জির কাছে একটা বড় অপারেশনের দাগ আছে। আশ্চর্যের কথা—অ্যাগনেসের পাসপোর্টে 'পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন মার্ক' হিসাবে ঐ চিহ্নটাই উল্লিখিত। পঞ্চমত অ্যাগনেস্‌ যে রোকেব্রুন-এর হোটেল 'লা ম্যাগ্‌নিফিক'-এ গিয়ে ছদ্মনামে কয়েক রাত্রি বাস করে আসে এটা প্রায় নিশ্চিত—ঐ হোটেলের ম্যানেজার তার ফটো দেখে সনাক্ত করেছে।

— তুমি কেমন করে জানলে ?

— নেদারল্যান্ড ইন্টেলিজেন্স সূত্র থেকে। তারা'জিল'-কে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের ধারণা সেই মেয়েটির হেপাজতেই আছে ঐ মারাত্মক ফাইলটা।

—কিন্তু রোকেব্রুন-এর সঙ্গে জিল-এর সম্পর্ক কী ?

— অ্যাগনেস্‌ আপনাকে 'প্রিমেভেরা' প্রসঙ্গে কিছু বলেনি ?

— 'প্রিমেভেরা' ? বত্তিচেল্লির আঁকা সেই ছবিখানা ? না।

— না, স্যার। বত্তিচেল্লির 'প্রিমেভেরা'নয়। এ একটা বাড়ির নাম। শুনুন তবে—

আমস্টার্ডাম পুলিসের তথ্যসূত্র থেকে যেটুকু খবর সংগ্রহ করেছিল এবার তা পেশ করে। অর্থাৎ হান ভাঁ মীগেরেঁ দ্বিতীয়বার বিবাহ করার পরে হনিমুনে বেরিয়ে মাঝপথে থেমে যায়। মাঝপথ অর্থে দক্ষিণ-ফ্রান্সের ঐ রোকেব্রুন শহর। ছোট্ট গণ্ডগ্রাম—সমুদ্রের কিনারে একটা টুরিস্ট স্পট। কিন্তু স্নানের সুবিধা নেই : তাই টুরিস্টরা বেশিদিন থাকে না। আসে আর যায়। সেখানেই এসে উঠেছিল মীগেরেঁ তার সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রী জোহানাকে নিয়ে। তারপর কিমাশ্চর্যমতঃপরম ! ঐ শহরেই একটা বাড়ি ভাড়া করে সে একা-একা থাকতে শুরু করে। নব পরিণীতা বধূ ফিরে যায় পারীতে। এমনটা হয় না, হবার কথা নয়। কিন্তু তাই ঘটেছিল। দ্বিতীয়বার বিবাহ করার পরে কী-জানি কেন হান ভাঁ মীগেরেঁ দীর্ঘ পাঁচ-ছয় বছর স্বেচ্ছাবন্দীর জীবন অতিবাহিত করেন ঐ পাণ্ডববর্জিত গ্রামের একটা ভুতুড়ে বাড়িতে—হ্যাঁ,'ভূতের বাড়ি' বলেই সেই প্রাসাদোপম অট্টালিকা ফাঁকা পড়ে ছিল কয়েক বছর। ওখানে একটি জোড়া খুন হবার পর। বাড়িটার নাম



'প্রিমেভেরা' !

এখানে যখন মীগেরেঁ থানা গেড়েছে তারপর থেকেই বিশ্বললিতকলায় পর পর খান-কয়েক 'ভেরমিয়ার' আবিষ্কৃত হয়। আর ঘটনাচক্রে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকখানি ছবিই কোন-না-কোন সময়ে এসেছে হান ভাঁ মীগেরেঁর সংগ্রহশালায়।

লে লোরেনের মনে পড়ে গেল—ওর ভিতর পাঁচখানি বিশ্ববন্দিত তৈলচিত্রের আবিষ্কারক স্বয়ং হান ভাঁ মীগেরেঁ।

— 'প্রিমেভেরা' ছেড়ে তিনি যখন পুনরায় আমস্টার্ডামে এসে বসবাস শুরু করলেন তখন তিনি কোটিপতি। ইতিমধ্যে তিনি নাকি বার দুয়েক ন্যাশনাল লটারির প্রথম পুরস্কার লাভ করেছেন।

পঁয়ক্যারের দীর্ঘ কাহিনী শেষ হলে ডক্টর লোরেন জানতে চাইলেন—তুমি বলছ, মীগেরেঁ ঐ 'প্রিমেভেরা'তে থাকতে থাকতে প্রথম যে অরিজিনাল ভেরমিয়ার আবিষ্কার করেন সেটা সওয়া পাঁচ লক্ষ গিল্ডার্সে বিক্রি হয়েছিল। কে কিনেছিলেন ?

— ডক্টর ডেভিড বুন। উনত্রিশে আগস্ট 1937 সালে। ডক্টর বুন আমস্টার্ডামের একটি প্রখ্যাত সলিসিটার্স ফার্মের সিনিয়ার পার্টনার। অত্যন্ত মানী-ব্যক্তি। অগাধ সম্পত্তির মালিক। সে সময়ে একজন প্রভাবশালী পার্লামেন্টেরিয়ান। তিনি মিছে কথা বলার লোক নন। তিনিই ঐ সদ্য-আবিষ্কৃত ভেরমিয়ারখানি সওয়া পাঁচ লক্ষ গিল্ডার্সে ক্রয় করেছিলেন। ছবিটার নাম ক্রাইস্ট অ্যাট ইম্মায়ুস। ডক্টর ব্রেডিউসকে দিয়ে যাচাই করিয়ে। অর্থাৎ ছবিটা সত্যই ভেরমিয়ারের আঁকা এটা প্রমাণিত হবার পরে।

— মীগেরেঁ ছবিখানি কী করে উদ্ধার করল সে কথা ডক্টর বুনকে বলেছিল ?

— বল্‌তে হবেই। সে একটা আষাঢ়ে গল্প শুনিয়েছিল। তাকে নাকি ছবিখানি এনে দেয় একটি ইতালিয়ান মহিলা—তার নাম 'মাভ্‌রোখ্‌'।

— সওয়া পাঁচ লক্ষের ভিতর মীগেরেঁ সেই মহিলাকে কত দিয়েছিল ?

— তার হিসাব নেই! মাভ্‌রোখ্‌কে মীগেরেঁ আদৌ কিছু দিয়েছিল কি না তার প্রমাণ নেই। বরং নেদারল্যান্ডস্‌ ইন্টেলিজেন্স থেকে আর একটি বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহ করেছিলাম আমি : উনিশ শ উনচল্লিশে, মানে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার মাস ছয়েক আগে রোকেব্রুন-এর হোটেল 'লা ম্যাগনিফিকে' একটি মেয়ে একা এসে উঠেছিল। বছর চব্বিশ বয়স। রেজিস্টারে সে নাম লেখায় 'মাভরোখ্‌'। লিখেছিল তার প্রাক্তন নিবাস : মিলান, ইতালী। উদ্দেশ্য হিসাবে লিখেছিল : দেশ ভ্রমণ। মেয়েটি দিন-তিনেক পরে হোটেল থেকে বেমক্কা নিখোঁজ হয়ে যায়। স্থানীয় পুলিস সন্দেহ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। মস্যুয়ে মীগেরেঁ তখনো থাকতেন ঐ 'প্রিমাভেরা'য়। একেবারে একা। অতবড় বাড়িতে! চাকর-বাকর, হেল্পিং-হ্যান্ড কিচ্ছু ছিল না। নিজেই রাঁধাবাড়া করতেন। নিজেই বাসনপত্র ধুতেন। বাড়ি থেকে বারই হতেন না। শুধু মাঝে মাঝে বাজার করতে বার হতেন। দিবারাত্র একটা জোয়ান মানুষ অতবড় বাড়িতে কেমন করে দিন কাটায় এ নিয়ে পাড়া-পড়াশীদের দুরন্ত কৌতূহল। পুলিস যখন নিরুদ্দিষ্টা 'মাভ্‌রোখের'সন্ধান করছে তখন মীগেরেঁর এক প্রতিবেশী পুলিস-স্টেশনে এসে গোপনে জানিয়ে যায়—প্রিমেভেরার চিম্‌নি দিয়ে নাকি ক্রমাগত ধোঁয়া বার হয়। তাতে অনেক সময় দুর্গন্ধ থাকে। এমনকি মধ্যরাত্রেও—যখন গৃহস্বামী প্রত্যাশিতভাবে নিদ্রাগত তখনো ধোঁয়া বের হওয়া বন্ধ হয় না। পুলিসের সন্দেহ হয়, ঐ বিদেশী আর্টিস্ট ভদ্রলোক যে কোন কারণেই হোক মেয়েটিকে খুন করেছে। পুলিস অবশ্য

কোন 'মোটিভ' খুঁজে পায়নি। হত্যা করার হেতুটা। কারণ সন্দেহভাজন ব্যাক্তি যে ঐ মাভ্রোখ্ নামের মেয়েটির কাছে থেকে একটি অনবদ্য ভেরমিয়ার উদ্ধার করেছেন, আর সেটা প্রায় পাঁচলক্ষ গিল্ডার্সে বিক্রি করেছেন—এ খবর পুলিস পায়নি। কারণ ডক্টর বুন তথ্যটি গোপন রেখেছিলেন। মীগেরেঁর অনুরোধেই। কারণ মীগেরেঁ ডক্টর বুনকে বলেছিল, মাভ্রোখ্ ছবিটা ইতালী থেকে গোপনে নিয়ে এসেছে । তার নামটা জানাজানি হলে তার উপর ফাসিস্ত ইতালী অত্যাচার করবে। এদিকে ডক্টর বুন আবার জানতেন না যে, ঐ গণ্ডগ্রামে অর্থাৎ রোকেব্রুন-এর পুলিস মীগেঁরেকে মার্ডার চার্জ-এ অভিযুক্ত করতে চায়। মাভ্রোখের অন্তর্ধানের বিষয়েও তিনি আমস্টার্ডামে বসে কোনও খবর পাননি। সে যাই হোক, রীতিমত সার্চ-ওয়ারেন্ট নিয়ে ফ্রেঞ্চ পুলিস প্রিমেভেরাতে খানা-তল্লাসী করে। আপত্তিজনক কিছুই পায়নি। মোটকথা মীগেরেঁর বিরুদ্ধে কোন জোরালো প্রমাণই পাওয়া যায়নি। ওদিকে মাভ্রোখ্কে তারপর আর কেউ কোথাও দেখেনি!
বৃদ্ধ লোরেন অনেকক্ষণ কোন কথা বললেন না। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, পঁয়ক্যারে! তুমি বোধহয় ঠিক কথাই বলেছ। এ তদন্ত যৌথভাবে হবার নয়! ঠিক আছে, তোমাকে এ দায়িত্ব আমি দিচ্ছি না। অ্যাগনেসের সঙ্গে আর একবার কথা বলি। তবে অ্যাগনেস্ যখন আমস্টার্ডামে যাবে, তখন সব ব্যবস্থাপনা তোমাকেই করতে হবে। অর্থাৎ তার নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা।

## ॥ পাঁচ ॥

অফিস ছুটি হতে যখন আর মিনিট-দশেক বাকি তখন অ্যাগনেস শ্যাম্পেনের টেবিলে টেলিফোনটা বেজে উঠল। টেলিফোনটা তুলে নিতেই ও-প্রান্ত থেকে সম্পাদক ডক্টর লোরেন বললেন, তুমি বাড়ি যাবার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেও। কথা আছে।
ফাইল-পত্র গুছিয়ে অ্যাগনেস্ একবার টয়লেটে গেল। সম্পাদকের ঘর থেকে সে সোজা পথে নামবে। তাই অভ্যাসমত টয়লেটে গিয়ে চুলটা একটু ঠিক করল। মুখে-চোখে জল দিয়ে টিশু-পেপারে মুছে নিল। হাল্কা করে লিপ্স্টিক লাগালো। তারপর সম্পাদকের চেম্বারে এসে দেখে তিনি ওর প্রতীক্ষাতেই অপেক্ষা করছেন।
— বস, তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করার আছে!
অ্যাগনেস্ সামনের ভিজিটিং-চেয়ারে আল্‌তো করে বসল।
— আগামী কালকের 'ফিগারোর' হেড-লাইন নিউজটা দেখেছ?
— না স্যার, কেন?
ডক্টর লোরেন বললেন, হান ভাঁ মীগরেঁ আমস্টার্ডামের পুলিস-কমিশনারকে একটা চ্যালেঞ্জ থ্রো করেছে: সে পুলিসের চোখের সামনে নতুন একখানা অরিজিনাল ভেরমিয়ার পয়দা করে দেবে। পুলিস-কমিশনার ডি-ভেল্ডি সে চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেছেন! আমস্টার্ডামে এখন শুরু হচ্ছে সেই দ্বৈরথ-সমর।
অ্যাগনেস্ মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারল না। বলে, তার মানে?
— তার মানে, মীগেরেঁ দাবী করেছে—গত ছয় বছরে যে নয়খানা অরিজিনাল ভেরমিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে তার প্রত্যেকটি তার নিজে-হাতে আঁকা! 'ইম্মেয়ুস-এর পান্থশালায় যীশু' থেকে শুরু করে 'অ্যাডালটারেস', প্রত্যেকখানি ছবি নাকি পয়দা হয়েছে হান ভাঁ মীগেরেঁর তুলি থেকে!
— এ তো বদ্ধ উন্মাদের প্রলাপ, স্যার! ঐ নয়খানি ছবিই তো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেছেন আর্ট-কনৌশারেরা! এমনকি ডক্টর ব্রেডিউস স্বয়ং! সার্টিফাই করেছেন—সেগুলি অরিজিনাল ভেরমিয়ার। তারপর বিশ্বের বিভিন্ন আর্ট-গ্যালারী তা লক্ষ-লক্ষ গিল্ডার্সে কিনে সাজিয়েছে! তা নকল-ছবি হতেই পারে না!
— মীগেরেঁর বক্তব্য-সে-সব কথা ও জানে। ওর বক্তব্য বিশ্বের যাবতীয় আর্ট-কনৌশার ভুল করেছেন! প্রত্যেকটি ছবি তার নিজে-হাতে আঁকা। ডি ভিল্ডিকে সে বলেছে—পুলিসের চোখের সামনে সে আবার একখানা অরিজিনাল ভেরমিয়ার এঁকে দেবে—যা দেখে কোনও সান-অব-এ-বীচ আর্ট-কনৌশার ধরতে পারবে না। বলবে সেটাও ভেরমিয়ায়ের হাতের কাজ! ডি ভেল্ডি সেই চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেছেন। মীগেরেঁকে তার স্টুডিওতে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে! একমাস ধরে সে ঐ ছবিখানা আঁকবে রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে, একমাত্র পুলিস-প্রহরায়।
অ্যাগনেস্ অনেকক্ষণ কোনও জবাব দিল না। সে যেন গভীরভাবে কিছু ভাবছে। যেন অনেক-অনেকদিনের নিরুত্তর-প্রশ্নের জবাব খুঁজছে সে মনের ভিতরটা হাতড়িয়ে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সেটা অসম্ভব! তা হতেই পারে না। খুব সম্ভবত মস্যুয়ে মীগেরেঁ তাঁর মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। ডিলিরিয়াম বকছেন!
— ডি-ভেলডিরও তাই ধারণা।
— আপনি এখন কী করতে চান?
— আমি এইমাত্র আমস্টার্ডামের পুলিস-কমিশনারের সঙ্গে ট্রাঙ্ককলে কথা বললাম । সে রাজী হয়েছে একমাত্র আমার কাগজের প্রতিনিধিকে ঐ রুদ্ধদ্বার কক্ষে উপস্থিত থাকবার অনুমতি দিতে। সংবাদপত্রের নিরপেক্ষ প্রতিনিধি হিসাবে। এ একটা দুর্লভ সুযোগ। আমি জানি, টাইম্স্, ডেলি টেলিগ্রাফ, এবং আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রেঞ্চ জার্নাল 'মাতিন'ও অনুরূপ প্রস্তাব পাঠিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ডি ভেল্ডি শুধুমাত্র ফিগারোকে যে সুযোগ দিতে রাজী হয়েছে; তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে চাই আমি। কাল সকালের প্লেনেই তুমি আমস্টার্ডাম চলে যাও। একমাস থাকতে হবে তোমাকে। সব খরচ-খরচা—বলা বাহুল্য—পত্রিকার। সব ব্যবস্থা করবে আমস্টার্ডামে আমাদের প্রতিনিধি পঁয়ক্যারে।
অ্যাগনেস্ বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করল। কাগজ-চাপাটা নিয়ে অহেতুক নাড়াচাড়া করল। তারপর বলল, ডি-ভেলডি আর সবাইকে প্রত্যাখ্যান করে শুধুমাত্র ফিগারোকেই যে এককথায় অনুমতি দিল এ ব্যাপারটা আপনার কাছে অদ্ভুত লাগছে না?
— এককথায় তো সে রাজী হয়নি। তাকে রীতিমতো পীড়াপীড়ি করতে হয়েছে—।
— আপনি কি জানিয়েছিলেন—আপনার নিজস্ব প্রতিনিধির নাম?
— হ্যাঁ, জানিয়েছি। দেখলাম, সে তোমাকে নামে চেনে। ডি-ভেল্ডি নিজেও আর্ট-কালেক্টার। তার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালাটি নাকি দেখবার মতো। তাই সে তোমার নাম জানে—মানে, ফিগারোর অ্যাসিস্টেন্ট আর্ট-ডিরেক্টাররূপে।
মাথা ঝাঁকিয়ে অ্যাগনেস বলে, না স্যার, এর পিছনে অন্য ব্যাপার আছে।

— অন্য ব্যাপার! মানে? কী ব্যাপার?

— আমাকে সে ব্যক্তিগতভাবে জানে, চেনে। যুদ্ধ বাধার আগেই আমি একবার আমস্টার্ডামে গিয়েছিলাম—ঐ ডাচ-পেইন্টারদের নিয়ে গবেষণার ব্যাপারে। কোন একটা অলীক অভিযোগে নেদারল্যান্ড-পুলিস আমকে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল। আমি কোনক্রমে ওদের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম। তাই ডি-ভেল্‌ডি যেই শুনেছে আপনি আমাকেই পাঠাতে চাইছেন, অমনি সে রাজী হয়ে গেছে। আমাকে হল্যান্ডের যে-কোন জায়গায় দেখতে পেলেই ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করবে।

বৃদ্ধ কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে বলেন, অভিযোগটা যখন অলীক, তখন আমার পক্ষে সেটা জেনে রাখা ভাল। কী জাতের অভিযোগ?

— সেটা স্যার, আমার পার্সোনাল ব্যাপার। আমি বলতে পারব না।

বৃদ্ধ গম্ভীর হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ! তারপর বলেন, তার মানে সবটাই অলীক অভিযোগ নয়। তাই কি?

— আপনার এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না, স্যার।

— আই সী! তাহলে আর একটা প্রশ্নের জবাব দাও :তুমি জ্যাক মীগেরেঁর নাম শুনেছ?

অ্যাগনেস্ চকিতে মুখ তুলে তাকায়। বলে, হ্যাঁ, কেন?

— সেদিন আমি যখন হান ভাঁ মীগেরেঁর জীবনীটা জানতে চাইলাম তখন তো তুমি বলনি, যে হানের একমাত্র পুত্র জ্যাক দেশদ্রোহিতার অপরাধে বাটাভিয়ায় প্রাণ দিয়েছে?

অ্যাগনেস একটু গুছিয়ে নিয়ে বললে, সেটা মসুঁয়ে মীগেরেঁর জীবনের ঘটনা নয়। জ্যাক প্রাণ দিয়েছে তার মায়ের সঙ্গে বাবার বিবাহ-বিচ্ছেদের অনেক পরে।

— তুমি যখন সুমাত্রাতে থাকতে তখন জ্যাক মীগেরেঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে?

— আপনি এসব প্রশ্ন কেন করছেন?

— কারণ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সব সহকর্মীর সব রকম 'লুপহোল' সম্বন্ধে আমার অবহিত থাকা দরকার। বল, জ্যাক মীগেরেঁকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতে?

হঠাৎ আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায় অ্যাগনেস্। বলে, আপনি যা জানতে চাইছেন তা আমি মুখে বলতে পারব না। আমার লিখিত স্টেটমেন্ট আধঘণ্টার মধ্যেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লোরেন একটু বিস্মিত হলেন। কিন্তু অ্যাগনেস্‌কে বাধা দিলেন না।

অ্যাগনেস্ গট্‌গট্ করে ফিরে এল নিজের টেবিলে। তখন অফিস ছুটি হয়ে গেছে। অধিকাংশ সহকর্মীর চেয়ার খালি! যারা রাত্রের শিফ্‌টে কাজ করবে তারাই শুধু যে-যার কাজে নিবদ্ধদৃষ্টি। অ্যাগনেস ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসল। মিনিট-পাঁচেক গালে হাত দিয়ে কী যেন ভাবল। লেটার-প্যাডের উপর আন্‌মনে আঁকিবুকি কাটল কিছুক্ষণ। তারপর সে মনস্থির করল। টাইপ্‌রাইটারের ঢাকনা খুলে একখণ্ড কাগজ ভরে দিল তাতে। বাড়তি কার্বন দিল না। অফিস-কপি রাখবে না সে। তারপর তার দু-হাতের দশটা আঙুল কালবৈশাখী ঝড়ের মাতনে নেচে উঠল। মিনিট-দশেক পরে মেশিন থেকে কাগজটা বার করে পড়ল। না, মানসিক উত্তেজনা সত্ত্বেও আঙুলগুলো বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। কোন ছাপার ভুল হয়নি চিঠিখানায় :

"ডিয়ার ডক্টর লোরেন, নিজের ক্রুশ নিজেকেই বইতে হয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন কিছু গুপ্তকথা থাকে, যা দ্বিতীয় ব্যক্তি—এমনকি জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীকেও



জানানো যায় না—এম্প্লয়ার তো দূরের কথা। তবে হ্যাঁ, আপনার যুক্তিটাও অনস্বীকার্য! সম্পাদক হিসাবে সব কর্মীর সব-রকম 'লুপ-হোল' সম্বন্ধে আপনার অবহিত থাকা প্রয়োজন। না হলে এতবড় দায়িত্বপূর্ণ কাগজের সম্পাদনা করবেন কেমন করে? দুটি সমস্যার একটিমাত্র সমাধান। সেই সমাধানটুকু এ পত্রের সঙ্গে যুক্ত করে দিলাম! আপনার কাছে আমার না-দেখা বাপের স্নেহ পেয়েছি, এজন্য বিদায় কৃতজ্ঞতা জানাই। আচ্ছা, বাপকে কি মেয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়? ঠিক জানি না। জানবার সৌভাগ্য আমার হয়নি!"

এই ব্যক্তিগত চিঠির সঙ্গে স্টেপ্‌ল্ করে গেঁথে দিল তার ফর্মাল পদত্যাগপত্র। চিঠি দুটি খামে ভরে মুখটা বন্ধ করল। খামের উপর লিখল : 'ব্যক্তিগত ও জরুরী'।

এবার উঠে ওর পার্সোনাল লকারটা খুলল। বার করে আনল একটা নীল রঙের ডোশিয়ার ফাইল।সেলোফেন পেপারে মোড়া। ইতস্তত করল। হাতঘড়িটা দেখল একবার : সন্ধ্যা সাতটা। বাইরে পারীর পথে-পথে তখন আলো-আঁধারের লুকোচুরি। যুদ্ধবিধ্বস্ত পারী তখনো নিয়নবাতির শতনরী পরিধান করেনি তার কণ্ঠে। ব্ল্যাক-আউটের ঠুলি অপসারিত হয়নি। এমন আলো-আঁধার পথে ঐ ফাইলটা নিয়ে বার হতে সাহস হল না অ্যাগনেসের। একটা পরাধীন দেশের শতশহীদের রক্তে রাঙানো ঐ মূল্যবান ফাইলখানাই ওর ক্রুশকাষ্ঠ। ও স্বেচ্ছায় সেটা কাঁধে বয়ে বেড়াবার দায়িত্ব নিয়েছে! কাঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত!

ফাইলটাকে যথাস্থানে রেখে লকারটা বন্ধ করল আবার। চাবিটা হাত-বটুয়ায় ভরে লোরেনের খামটা খুলে ফেলল। পত্রশেষে একটি পুনশ্চ সংযোজন করল :

"অফিস-লকারে আমার কিছু মূল্যবান কাগজপত্র রেখে যেতে বাধ্য হচ্ছি। কাল দিনের বেলা এসে সেগুলি অপসারিত করব এবং শূন্য লকার আমার স্থলাভিষিক্তের জন্য রেখে যাব।"

নূতন খামে চিঠিখানা ভরে আবার নাম লিখল।

সম্পাদকের চেম্বারে ব্যক্তিগত কোন চিঠি বা কাগজ পাঠানোর জন্য একটি বিশেষ বেল্ট-কেরিয়ার আছে। সেটা ক্রমাগত চলতে থাকে। তার উপর খামটা রেখে ও পথে নামে।

একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। কাল থেকে ও বেকার।

ফিগারোর হেড-অফিস প্লাস দে লা কঁকদ-এর দক্ষিণে পঁদে লা কঁকদে। সে'ন নদীর উত্তর পারে। অ্যাগনেসের অ্যাপার্টমেন্ট অনেকটা পুবে—পঁদে দামিয়েৎ ছাড়িয়ে। অফিস থেকে ফেরার পথে ও সাধারণত ভূগর্ভস্থ টিউব-রেলে যায়। তাতে সময়টা সংক্ষেপে হয়। আজ তার হাতে অঢেল সময়। বস্তুত এখন সময় কাটানোই ওর পক্ষে বিড়ম্বনার। কাল থেকে সে-সব কথা ভাবা যাবে। আজ ও হেঁটে ফিরবে অনেকটা পথ। সে'ন নদীর উত্তর-পাড় ধরে হাঁটতে থাকে। অফিস ছুটির ভীড়। পিল্‌পিল্ করে মানুষজন চলেছে। ওদের জন্য বাড়িতে অপেক্ষা করে আছে প্রিয়জন। নদীর ওপারটা বরং ফাঁকা। পঁ দে আৎস্ সাঁকো বেয়ে সে চলে এল সে'ন এর বাম তীরে। সামনেই অ্যাঁস্তুৎ দ্য ফ্রাসঁ; তারপরেই নত্রদাম গীর্জা। একটি দ্বীপের মধ্যে। গৌহাটির কাছে ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে উমানন্দের শিবমন্দিরের মতো। নত্রদাম গীর্জার দুপাশ দিয়েই বয়ে চলেছে সে'ন। তফাৎ এই উমানন্দের মতো নত্রদাম গীর্জায় উপনীত হতে হলে ভয়াবহ নৌযাত্রার প্রয়োজন নেই। পারী নগরীর এক দিক্‌চিহ্ন ঐ গীর্জাটি—'হাঞ্চ ব্যাক'-এর কাহিনীধন্য

স্থাপত্যচিহ্ন। বিশ্বললিতকলার সৌভাগ্য বলতে হবে নাৎসী বিমানের বোমাবর্ষণে পারীর এইসব শতাব্দীসঞ্চিত স্থাপত্য বিধস্ত হয়নি। নদীর এই বামতীরে পাশপাশি ত্রিপলখাটানো কফি-কর্নার, স্ন্যাক-বার, আইসক্রীম-পার্লার আর মদিরা-বিপণী। অ্যাগনেস একটা কিয়স্ক-এ এসে বসল। সেল্ফ্-হেল্প্ আয়োজন। হঠাৎ ওর মনে হল বেকার-জীবনের এই উষালগ্নটা সেলিব্রেট করা উচিত। ও একপাত্র রেমি মার্টিন কনিয়াগ্ নিয়ে জমিয়ে বসল। সচরাচর সে শ্যাম্পেন পান করে না। আজ ওর বিগত জীবনসঙ্গীর কথা বেশি করে মনে পড়ছে। ওর স্বামী ডক্টর শ্যাম্পেন থাকলে আজ ওকে নিশ্চয় অভিনন্দন জানাত—এই সিদ্ধান্তের জন্য।

অ্যাগনেস্ কী করতে পারত? ফিগারো পত্রিকার গোপনবার্তা যেমন সে জানাতে পারত না তার জীবনসঙ্গীকে, তেমনি আজ ফিগারো-সম্পাদককেও জানাতে পারে না ডক্টর আহ্‌মেদ সুকর্ণের গোপন কথাটাও! আবদুল মহম্মদের কাছে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ! ঐ ফাইলটার কথা সে আজীবন গোপন করে রাখবে—যতদিন না সেই রেস্তোরাঁর—সেই ব্যাটাভিয়া-বন্দরের কিনারে 'লাল-ড্রাগন' পান্থশালার বাকি আধখানা বিল-ভাউচার নিয়ে প্রত্যাশিত মানুষটি উপস্থিত হয়। মনে আছে নির্দেশ—গ্রে-সুট, লালটাই, পোখরাজের টাইপিন পরা একটা অজানা মানুষ এসে ওর কাছে দশ-ডলারের ভাঙানি চাইবে। ওকে দেখাবে সেই বিল-ভাউচারের বাকি আধখানা!

স্পষ্ট মনে আছে সেই সন্ধ্যার ঘটনাটা। সেই যেদিন সে ইস্ট-ইন্ডিজ ত্যাগ করে ইউরোপের পথে রওনা হয়েছিল।

ব্যাটভিয়া বন্দরের 'লাল-ড্রাগন' রেস্তোরাঁয় একান্তে দুটি চেয়ার দখল করে বসেছিল ওরা দুজন — অ্যাগনেস আর আবদুল মহম্মদ। রেস্তোরাঁর ছোকরটা টেবিলে রেখে গেছে আহার্য-পানীয়। সী-ফিশের ঝোল, ভাত আর স্থানীয় একটা নরমজাতের মাদকপানীয়। রেস্তোরাঁ তখন প্রায় নির্জন। এত সন্ধ্যারাত্রে কেউ ডিনার খেতে আসে না ব্যাটাভিয়ায়। মহম্মদ বলেছিল, জিল-বহিন, ভুলো না, তোমার নাম অ্যাগনেস : তোমার বাবা আর মায়ের বিবাহ হয়নি। তুমি বাস্টার্ড! হঠাৎ যদি কেউ পিছন থেকে তোমাকে 'জিল' নামে, অথবা তোমার স্বনামে ডেকে ওঠে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবে না। এই ভুলটা অনেকেই করে ফেলে, ধরা পড়ে যায়। তাই পথে বার হবার সময় প্রতিবার স্মরণ করবে আবার এই সাবধানবাণী—মনে করবে, আজই কেউ তোমাকে ঐভাবে ফাঁদে ফেলতে চাইবে। নিজের নামটা ভুলে যাবে, নিজের সত্য পরিচয়টাও। আজ থেকে তুমি অ্যাগনেস্ আহমেদ!

অ্যাগ্‌নেস্ জানতে চেয়েছিল, সে মেয়েটি আসলে কে?

— আমারই এক কাজিন! মারা গেছে! তারই পাসপোর্টে তুমি ফ্রান্সে যাচ্ছ।

—কিন্তু এই পাসপোর্টটা যে জাল তা ধরা যাবে না?

—কেমন করে যাবে? তোমাদের দুজনের একই বয়স, তোমার ডান-হাতের কব্জিতেও অপারেশন করা হয়েছে, পাসপোর্টে যে ফটো সাঁটা আছে সেটা তোমার। তোমার যে দৈহিক বর্ণনা আছে-নীল চোখ,ব্লন্ড চুল,মায় পাসপোর্ট অফিসারের স্বাক্ষর আর সীলটাও সাঁচ্চা! ধরবে কেমন করে?

— কী করে জোগাড় করলে এমন পাসপোর্ট?

— ডাক্তার সা'ব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পাসপোর্ট অফিসেও আছে আমাদের পার্টির লোক।



— সে কি ইন্দোনেশিয়ান? ডাচ্ নয়?

আবদুল হাসল। বলল, বোকার মত কথা বলছ কেন জিল-বহিন? তুমি কি ডাচ্ নও? জ্যাক মীগেরের ধমনীতে কি ডাচ্-রক্ত বইত না?

হঠাৎ জ্যাকের উল্লেখে অ্যাগ্‌নেসের চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। ন্যাপকিন্ দিয়ে চোখটা মুছে নেয়। আবদুল অনুতপ্ত হয়ে বলে, আয়াম সরি!

— না, না, তোমার দু:খিত হবার কিছু নেই। হঠাৎ এই বিদায়বেলায় জ্যাকের কথা উঠে পড়ায়...যাক সে-কথা, কী-যেন বলছিলে তখন?

— তোমাকে একটা অত্যন্ত জরুরী,অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়নি। শোন, মন দিয়ে শোন— চারদিকে ভাল করে দেখে নিয়ে আবদুল মহম্মদ নিম্নকণ্ঠে বলেছিল, তোমার কেবিন নম্বর হচ্ছে সাতাশ। ডবল্-বেডেড কেবিন। তোমার সঙ্গিনী একজন মিশ্‌নারী নান্—ডাচ মহিলা। তুমি জাহাজে উঠে কেবিনটা খুঁজে নেবে। দুটি বিকল্প সম্ভাবনা—হয় সেই মহিলাটি তোমার আগেই কেবিনে উপস্থিত হতে পারেন, অথবা তোমার পরে। সে যাই হোক, তুমি উপরের বাঙ্কটা নিও। সেটাই স্বাভাবিক—বর্ষিয়সী সহযাত্রীকে নিচের বার্থটা ছেড়ে দেওয়া। তুমি কেবিনে পৌঁছেই এই ছোট্ট অ্যাটাচি-কেসটা তোমার উপরের বাঙ্কে রেখে দেবে। তারপর কেবিনের বাইরে এসে অপেক্ষা করবে। একজন জাপানী ভদ্রলোক—যিনি তোমাকে চেনেন, কিন্তু তুমি তাঁকে চেন না—করিডোর দিয়ে এগিয়ে আসবেন। তাঁর পরনে গ্রে-রঙের সুট, গলায় লালরঙের টাই, তাতে পোখরাজ বসানো টাইপিন। তাঁর হাতে থাকবে হুবহু ঐ রকম একটা অ্যাটাচি-কেস। তোমার কাছে এসে তিনি বলবেন, 'মাদ্‌মোয়াজেল, তোমার কাছে দশ-ডলারের ভাঙানি হবে?' তুমি বলবে, 'হ্যাঁ, হবে। কেবিনের ভিতর আমার পার্সটা আছে।' তারপর তোমরা দুজনেই কেবিনে ঢুকবে। তুমি তোমার অ্যাটাচি-কেস খুলে পার্স থেকে দশ-ডলারের ভাঙানি দেবে এবং ভদ্রলোক তোমাকে এই দশ-ডলারের নোটটা দেবেন। নম্বরটা দেখে রাখ। তারপর তুমি তোমার সহযাত্রিনী ডাচ্ মহিলাটিকে—যদি তিনি কেবিনের ভিতরেই থাকেন—আড়াল করে দাঁড়াবে। জাপানী ভদ্রলোকটি ভাঙানি নিয়ে চলে যাবার সময় নিজের অ্যাটাচি-কেসটা রেখে ভুল করে তোমার অ্যাটাচি-কেসটা নিয়ে যাবেন। বুঝলে?

অ্যাগ্‌নেস্ বলেছিল, বুঝেছি, কিন্তু এসব করা হচ্ছে কেন?

— তুমি যখন জাহাজে উঠবে তখন তোমাকে ওরা সার্চ করবে। তাই তোমার অ্যাটাচি-কেসে থাকবে সাধারণ জামা-কাপড়-কসমেটিক। ঐ জাপানী ভদ্রলোক যিনি অ্যাটাচি-কেসটা নিয়ে জাহাজে উঠবেন, তিনি জ্যাকের সেই মারাত্মক ফাইলটা নিয়ে উঠবেন। ফাইলটাকে ইন্দোনেশিয়ার বাইরে পাচার করতে চাইছি আমরা। তোমাকে সে দায়িত্ব নিতে হবে। পারবে?

অ্যাগ্‌নেস্ বলেছিল, ধর যদি আমি রাজী হই। তারপর? আমি ওটা নিয়ে কী করব?

— সে কথা পরে বলছি; কিন্তু তার আগে তোমাকে জানিয়ে রাখা দরকার— ফাইলটা সমেত যদি তুমি ধরা পড়, তাহলে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত—এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?

— না বোঝার কোন কারণ নেই।

— তার পরেও তুমি জানতে চাইছ—ফাইলটা নিয়ে কী করবে?

অ্যাগ্নেস হেসে বলেছিল, আবদুল, তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি জ্যাককে ভালবাসতাম! সে যেজন্য প্রাণ দিয়েছে তার জন্য আমিও প্রাণ দিতে প্রস্তুত! এবার বল, ফাইলটা নিয়ে আমি কী করব? কাকে হস্তান্তর করব?

আবদুল মহম্মদ জবাব দিতে পারেনি। কারণ ঠিক তখনই বেয়ারাটা রেস্তোরাঁর বিল-ভাউচার আর ভাঙানি নিয়ে উপস্থিত হল। আবদুল তাকে এক 'রোপেয়া' বকশিস্ দিল। লোকটা পিছন ফিরতেই আবদুল পেড বিলটাকে দুটুকরো করে একটি টুকরো অ্যাগনেসের দিকে বাড়িয়ে ধরে। বলে, নাও এটা ধর।

— কী ওটা? কী হবে?

— যত্ন করে রেখে দাও তোমার ভ্যানিটি ব্যাগে। শোন, তুমি কখন কোথায় থাকবে তা আমরা খবর রাখব। তুমি শুধু ঐ ফাইলটা অত্যন্ত সাবধানে কোথাও লুকিয়ে রেখ। সময় আর সুযোগ মত আমাদের লোক তোমার সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করবে। হয়তো পাঁচ-দশ বছর পরে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে। তার পরিধানেও থাকবে ঐ একই পোশাক— গ্রে-সুট, লাল টাই, পোখরাজের টাইপিন। কিন্তু সেটাই সনাক্তিকরণের শেষ চিহ্ন নয়। কাউন্টার এস্‌পায়োনেজও ঐ পোশাকে তোমার কাছে ঐ ভাবে উপস্থিত হতে পারে। তাই সনাক্তিকরণের-চিহ্ন এই ভাউচারের বাকি আধখানা। খাঁজে-খাঁজে যদি মিলে যায় তবেই তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে তাকে দিয়ে দেবে ঐ গচ্ছিত সম্পদ!

অ্যাগনেস্ সেই শত-শহীদের রক্তে রাঙানো গচ্ছিৎ সম্পদটা আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছে আজও।

অ্যাপার্টমেন্টে যখন এসে পৌঁছালো তখন প্রায় মধ্যরাত্রি।

ভেবেছিল, জামা-কাপড় ছেড়ে নাইট-গাউনটা পরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে। তাও হল না। ওর দরজার সামনে অপেক্ষা করছে ফিগারো-অফিসের এক 'কুরিয়ার'। জরুরী চিঠিপত্র বিলি করার কাজ তার। ওকে দেখে বলল, থ্যাঙ্ক গড, রাত শেষ হবার আগেই আপনি এসে পৌঁচেছেন।

— কী ব্যাপার? তুমি?

— কাগজপত্রগুলো নিয়ে সই করে আমাকে মুক্তি দিন, ম্যাডাম। সেই সন্ধ্যারাত থেকে ধর্না দিয়ে বসে আছি।

অ্যাগনেস্ কথা বাড়ায় না। মোটা ম্যানিলা কাগজে মোড়া এন্‌ভেলাপটা নিয়ে ওর খাতায় সই করে দেয়। স্বয়ং সম্পাদকের দপ্তর থেকে এসেছে—পার্সোনাল ও আর্জেন্ট সীল-চিহ্ন সমেত। বড় খামখানির ভিতর আরও একটি সীলমোহর করা খাম। সেটির প্রাপক মস্যুঁয়ে পয়ঁক্যারে—আমস্টার্ডামের বিশেষ সংবাদদাতার নাম লেখা। সেটাও 'পার্সোনাল এবং আর্জেন্ট'। আর অ্যাগনেসকে লেখা ফিগারো সম্পাদকের একখানি চিঠি—ওর পদত্যাগপত্রের জবাব :

'মাই ডিয়ার অ্যাগ্নেস্,

'নিজের ক্রুশ যারা নিজেরাই বহন করে তাদের কপালের ঘাম মুছিয়ে দেবার অধিকার থাকে সান্তা ভেরোনিকার-ও। আমি সেই সান্তা ভেরোনিকার ভূমিকাটুকুই পালন করছি মাত্র। তোমার পদত্যাগপত্রটি প্রত্যর্পণ করলাম। 'দুটি সমস্যার একটিমাত্র



সমাধান আছে'— তোমার, যুক্তি আমি মেনে নিতে পারিনি। এই সঙ্গে আমস্টার্ডাম-এ যাবার এয়ার-টিকিট যুক্ত করে দিয়েছি। কাল সকাল নয়টায় তোমার প্লেন। আমস্টার্ডামে এয়ারপোর্টে তোমাকে রিসিভ করতে আসবে পঁয়ক্যারে—তাকে তুমি ভালই চেন। তার নাম-লেখা খামটা তাকে দেবে। তোমার জন্য আমস্টার্ডামে হোটেল বুক করে রেখেছে পঁয়ক্যারে। ফরেন এক্সচেঞ্জও সেই যোগাবে। তোমার ডেসপ্যাচ সেই প্রত্যহ পাঠাবে। তোমার লকারে যে সব জরুরী কাগজপত্র রেখে গেলে তার গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থেক। আরও একটা কথা—ডি-ভেলডি তোমাকে গ্রেপ্তার করবে না—এ গ্যারান্টি দিয়ে রাখছি। করলেই বা কী? সাংবাদিকতার কাজে খানিকটা ঝুঁকি তো নিতেই হয়। ফিগারো সম্পাদকের আশ্বাস পেয়ে নিশ্চয় তুমি সেটুকু রিস্ক নেবে। পঁয়ক্যারে তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। তার কথা মেনে চলবে। তোমার এই সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত কিনা বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, বাপ্ কি মেয়েকে কৃতজ্ঞতা জানায়? ঠিক জানি না। আমি কনফার্মড ব্যাচিলার। সেটা জানবার সৌভাগ্য আমার হয়নি।''

চোখ দুটি জলে ভরে এল অ্যাগনেসের।

## ।। ছয় ।।

বারই জুলাই, উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ—অর্থাৎ জেরার মুখে যেদিন ও আত্মসমর্পণ করল। এ কয়দিন দুঁজ আর ইন্টারোগেশানে আসেনি। দুঁজকে দেখলেই বন্দী 'হোস্টাইল' হয়ে ওঠে। সাফ জবাব দেয়—তোমার কোন কথার জবাব আমি দেব না। আমার বিরুদ্ধে চার্জটা কী, আগে তাই বল। তারপর আমার সলিসিটারকে সামনে রেখে যা বলার তা আমি বলব।

ফলে ইন্টারোগেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আমস্টার্ডাম পুলিসের কমিশনার ডি-ভেল্‌ডি স্বয়ং। অবশ্য তাঁর সময় অল্প। প্রশাসনিক কাজেই তাঁর দিন যায়। তবু তিনি নিজেও আর্ট-কলেক্টার। বহুদিনের জানা-শোনা মীগেরেঁর সঙ্গে। তাই প্রতিদিনই সন্ধ্যায় এসে বসেন। মীগেরেঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা, খোশ গল্প চলে—অধিকাংশই আর্ট সম্বন্ধীয়। কোন্ পত্রিকায় কী জাতের প্রবন্ধ বার হয়েছে তাই নিয়ে আলোচনা। বন্দী যেন বুঝতে না পারে যে, তাকে জেরা করতেই আসছেন উনি। অনেক বইপত্রও সরবরাহ করা হয়েছে ইতিমধ্যে! বন্দী কিন্তু সে সব নাড়াচাড়া করে না । দিবারাত্র চুপচাপ বসে থাকে । কী যেন ভাবে!

ওর সবচেয়ে অসুবিধা হয়েছে মর্ফিয়ার অভাব!

গত দশ-পনের বছর ধরে সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটা করে মর্ফিয়া ইন্‌জেকশান নেয়। জেল-কর্তৃপক্ষ সেটা অনুমোদন করেনি।

নেশার তাড়নায় যখন ছটফট্ করে না তখন সে অতীত-দিনের রোমন্থন করে চলে শুধু।

অ্যানা সৌভাগ্যের মুখ দেখে যায়নি! অ্যানার অন্তর্ধানের অনেক পরে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিল

মীগেরেঁ। কিন্তু প্রথমবার ছপ্পড়-ফোঁড় সৌভাগ্যে আকাশের চাঁদ যখন ধরা দিল—পুত্রকন্যা এবং তাদের গর্ভধারিণী জননীর সন্ধান করেছিল কলোনিয়াল অফিসে গিয়ে। ঠিকানা যোগাড় করতে সক্ষমও হয়েছিল। অ্যানা তখনও জাকার্তায় ইস্কুল মাস্টারী করে, আর জ্যাক তখনো জাকার্তাতেই কর্মরত। মোটা অঙ্কের একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ পাঠিয়েছিল প্রাক্তন স্ত্রীর নামে। সেটা 1936 সাল। ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট্খানা ফেরত এসেছিল ওর কাছে। চিঠির জবাব দিয়েছিল—অ্যানা মীগেরেঁ নয়, তার যুবক পুত্র : জ্যাক। জ্যাকের বয়স তখন কত? বছর বাইশ-তেইশ। তারুণ্যে ভরপুর। জীবনমৃত্যুকে যে বয়সে মনে হয় পায়ের ভৃত্য। জ্যাকের চিঠিখানা কি সে রাগ করে ছিঁড়ে ফেলেছিল? না কি আজও রাখা আছে ব্যাঙ্ক-ভল্টে? মনে নেই। কিন্তু চিঠিখানার কথা মনে আছে। মায় চিঠির ভাষাটুকুও।

জ্যাকের সম্বোধনটা ভুলবার নয়—'ডিয়ার মসুঁয়ে মীগেরেঁ!' বাপ্‌কে লেখা সন্তানের চিঠি! লিখেছিল, 'আমার মা তাঁর পূর্বজীবনের বেদনার স্মৃতি বহন করতে অপারগ এবং অনিচ্ছুক। তাঁর মতে—যা হারিয়েছেন তার পরিপূরক নেই—অন্তত অর্থমূল্যে! এখানে নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি আমাদের ভাই-বোনকে মানুষ করেছেন। ফলে 'অর্থ' কী, তার অর্থ তাঁর না-জানার কথা নয়। তা সত্ত্বেও তিনি আপনাকে জানাতে চান যে, লটারির টিকিটে আপনি হঠাৎ অগাধ অর্থ উপার্জন করেছেন শুনে তিনি আনন্দিতা। তিনি আরও জানাতে বলেছেন যে, আপনার এই অর্থপ্রাপ্তি তাঁর কাছে অনাশঙ্কিত সুসংবাদ নয়। তিনি তৃপ্তি পাবেন ঐভাবে লাভ করা আপনার অতুল বৈভব যদি সৎপথে ব্যয়িত হয়। পুনরায় যোগাযোগের চেষ্টা করবেন না। তাতে আপনার বিপদের আশঙ্কা আছে। ইতি জ্যাক।'

চিঠিখানা পাঠ করে রীতিমতো অবাক হয়েছিল মীগেরেঁ। একাধিক কারণে।

প্রথম কথা, অ্যানা কেন তার দান প্রত্যাখ্যান করল? অভিমান? প্রচণ্ড দারিদ্র্য সত্ত্বেও? দ্বিতীয় কথা, জ্যাক কেন লিখেছে—এই লটারি পাওয়ার ব্যাপারটা তার মায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে 'অনাশঙ্কিত সুসংবাদ নয়?' কথাটার মানে কী? এটা কি অ্যানার কাছে 'প্রত্যাশিত দুঃসংবাদ?' না কি 'আশঙ্কিত সুসংবাদ'? কী বলতে চেয়েছে ওরা? কতটা বুঝতে পেরেছে? এবং শেষ কথা, জ্যাক কেন লিখেছে—পুনরায় যোগাযোগের চেষ্টায় মীগেরেঁর তরফে বিপদের আশঙ্কা আছে?

শেষ প্রশ্নটার জবাব অনতিবিলম্বেই পেয়েছিল।

জানতে পেরেছিল—চব্বিশ বছরের জ্যাক তার ওলন্দাজ-রক্তকে অস্বীকার করে ঐ কয়লাকালো নিগারগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। হাত্তা না সুকার্নো—কী যেন নাম—সেই হতভাগাগুলোর দলে ভিড়ে গিয়েছিল। চেয়েছিল ডাচ কলোনিয়াল সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটাতে। প্রাণ দিল তাতেই।

— মস্যুয়েঁ মীগেরেঁ! আপনার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। আমি বন্ধুস্থানীয়। আপনার কোন ক্ষতি কি আমি করতে পারি? তাহলে কেন আমাকে সব কথা খুলে বলছেন না?

— মস্যুয়েঁ ডি-ভেল্‌ডি, সব কথা খুলে বললে আপনি ভাববেন আমি পাগল! তা ছাড়া সব কথা আমি নিজেও যে জানিনে ছাই! আমার কাছেও অনেক কিছু রহস্যঘন!

— কী রহস্যঘন? কোন ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছেন না?

— ঐ 'মাভ্‌রোখ এপিসোড'টা—সে কেমন করে হোটেল রেজিস্টারে স্বাক্ষর করল?



— কেমন করে আবার? সবাই যে ভাবে করে! সমস্যাটা কোথায়?

— কী আশ্চর্য! 'মাভ্‌রোখ' তো কোন বাস্তব মানুষ নয়! নামটা যে আমি পয়দা করেছি। সে যে আমার মনগড়া একটা কাল্পনিক চরিত্র। সে কেমন করে হোটেল রেজিস্টারে সই করবে?

— আপনি আবার সেই স্ট্যান্ড নিচ্ছেন? 'মাভ্‌রোখ' একটি কাল্পনিক মেয়ে?

— কী করব? আপনিই যে আমাকে সব সত্যি কথা বলতে বলছেন!

— তাহলে 'মাভ্‌রোখ' আপনাকে ছবিখানা দেয়নি বলতে চান? ঐ অ্যাডালটারেস'খানা? কিম্বা তার আগে সেই 'ক্রাইস্ট অ্যাট ইম্মায়ুস্'?

— সে-কথাই তো বল্‌ছি তখন থেকে।

— তাহলে কে দিয়েছিল ছবিখানা?

মীগেরেঁ হঠাৎ মনস্থির করে। বলে, সে-কথাও বলেছি। আপনারা বিশ্বাস করেননি। ভেবেছেন, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আমি ডিলিরিয়াম বক্‌ছি।

— কী কথা? কী বলেছেন?

— ভেরমিয়ারের ঐ 'অ্যাডালটারেস্' ছবিখানা আমাকে কেউ দেয়নি। ওখানা আমি এঁকেছি। নিজে হাতে! ঐ প্রিমেভেরাতে বসে!

ডি-ভেলডি শ্রাগ্ করে বলেন, আবার আপনি আবোল-তাবোল শুরু করেছেন!

— না, না, না! বিশ্বাস করুন! ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি— শুধু ঐ 'অ্যাডালটারেস্' নয়, বুঝেছেন—দশ-বছরের ভিতর আমি কম-সে-কম চৌদ্দখানা ছবি এঁকেছি যা লক্ষ লক্ষ গিল্ডার্সে বিক্রি হয়েছে! বুঝেছেন? আট-দশ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন আর্ট-গ্যালারিতে সেগুলি আজও শোভা পাচ্ছে! সব—সবই নকল! দশখানা ভেরমিয়ার, দুখানা দিহু, এক-একখানা ফ্রান্স হাল্‌জ্ আর তেবোর্গ! এক-আধখানা নয়। দশ বছরে দশখানা অরিজিনাল ভেরমিয়ার—যা মহান-শিল্পী ভেরমিয়ার নিজেও আঁকতে পারেননি!

ভি.ডেল্‌ডি কী বলবেন বুঝে উঠতে পারেন না। তবু কথার পিঠে কথা চালিয়ে যেতে হবে। বলেন, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন মস্যুয়েঁ মীগেরে। আপনি ডক্টর বুনকে যখন 'ক্রাইস্ট অ্যাট ইম্মায়ুস' ছবিখানি বিক্রি করতে যান তখন তিনি সেটা ডক্টর ব্রেডিউস্‌কে দিয়ে যাচাই করিয়ে নিয়েছিলেন!

— তাতে কী হল?

— তাতে প্রমাণ হল যে, 'ক্রাইস্ট অ্যাট ইম্মায়ুস' স্বয়ং ভেরমিয়ারের আঁকা — আপনার আঁকা নয়! আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ডক্টর ব্রেডিউস্ ছিলেন ভেরমিয়ার বিষয়ে অথরিটি। তিনি শুধু হল্যান্ডের নয়, বিংশতাব্দীর পৃথিবীতে..

— সব চেয়ে বড় বোকা-পাঁঠা! আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, বুড়োটা ইতিমধ্যে ফৌৎ হয়েছে। না হলে তাকে কান ধরে ওঠ-বোস্ করতে হত! নিজে মুখেই স্বীকার করতে হত সে শুধু হল্যান্ডের নয়, বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে সবচেয়ে বিখ্যাত বোকাপাঁঠা!

— বেশ, ব্রেডিউস্-এর কথা ছাড়ুন। আজকের দুনিয়াতেও আছেন অনেক অনেক আর্ট-কর্নৌশার এবং ভেরমিয়ার-বিশারদ। আমি যদি তাঁদের এখানে সমবেত করি তাহলে আপনি তাঁদের কাছে প্রমাণ করে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, 'ক্রাইস্ট অ্যাট ইম্মায়ুস' ছবিখানা ভেরমিয়ারের আঁকা নয় আপনার আঁকা?

— না, পারি না। কিন্তু কেন পারি না জানেন? শুনুন বলি: আজকের দুনিয়ায় যাঁরা তথাকথিত ভেরমিয়ার-বিশারদ বলে সম্মান পাচ্ছেন তাঁরা আমার ঐ দশখানি নকল ভেরমিয়ারকে আসল বলে ধরে নিয়ে নানান গবেষণা করেছেন। আর্ট জার্নালে প্রবন্ধ লিখেছেন, পি.এইচ.ডি করেছেন, ডি. ফিল্ করেছেন! এখনো তাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যাংশন করা অর্থে লেকচার-ট্যুর করে বেড়াচ্ছেন। আপনি কেমন করে আশা করেন—সেই সব স্বনামধন্য বোকাপাঁঠার দল মেনে নেবে যে, তাঁদের গালে আমি থাপ্পড় মেরেছিলাম?

— তাহলে আপনি প্রমাণ করতে পারেন না যে, ওগুলো আপনার আঁকা?

— কেন পারব না? বোকাপাঁঠারা মানতে চাইবে না মানে এ নয় যে, তা প্রমাণ করা যাবে না।

— কিন্তু প্রমাণ করবেন কার কাছে?

—বিজ্ঞানের কাছে। তথাকথিত আর্ট-কনৌশরদের কথা ভুলে যান মস্যুয়েঁ ডি.ভেল্ডি। আপনি কিছু প্রথমশ্রেণীর বৈজ্ঞানিককে জোগাড় করুন দিকি— পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নশাস্ত্র যারা বোঝে—মাইক্রো-কেমিস্ট্রি, রেডিওগ্রাফি, এক্স-রে ফটোগ্রাফের উপর যারা পড়াশুনা করেছে। আমি ল্যাবরেটারিতে বসে তাদের কাছে প্রমাণ করব এ ছবিগুলি বিংশ শতাব্দীতে আঁকা। আমার আঁকা তা অবশ্য প্রমাণ করতে পারব না। তাই আমার বিকল্প প্রস্তাবটা মেনে নিন না মসুয়েঁ কমিশনার?

— কী আপনার বিকল্প প্রস্তাব?

— পুলিস-প্রহরায় আমাকে একখানা ছবি আঁকতে দিন। আমার নিজস্ব স্টুডিওতে । আমার স্বাভাবিক খাদ্য-পানীয় মর্ফিয়া মঞ্জুর করুন। একখানা চারশ বছরের পুরানো ক্যানভাস আর কিছু খনিজ-আকর আমাকে সরবরাহ করুন। কথা দিচ্ছি—একমাসের মধ্যে আপনার ঐ দুঁজ না দুমা কী-যেন নাম— ওর চোখের সামনেই আমি আর একখানা নতুন অরিজিনাল ভেরমিয়ার পয়দা করে দেব। ইতিমধ্যে ঐ শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে আমন্ত্রণ করুন—

— শুয়োরের বাচ্চা?

— ঐ যাদের আপনি আর্ট-কনৌশার আর ভেরমিয়ার-বিশারদ বলেন আর কি! নিউইয়র্ক, সানফ্রান্সিস্কো, লন্ডন, পারীর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেই তেনাদের ডেকে পাঠান। আমস্টার্ডামে একটি 'ইন্টারন্যাশনাল কন্ফারেন্স অফ সোয়াইন্স,' অনুষ্ঠিত হক। ওদের শুধু জানাবেন না যে, পুলিস প্রহরায় ছবিটা আমিই এঁকেছি। দেখবেন, বিশ্বের তাবৎ ভেরমিয়ার-বিশারদ মুক্তকচ্ছ হয়ে যাবেন নতুন একটি ভেরমিয়ার আবিষ্কৃত হওয়ায়। তাবৎ রাষ্ট্রের ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি আপনাকে লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে সেই ছবিটি খরিদ করতে চাইবে।

— অল রাইট! আই অ্যাকসেপ্ট য়োর চ্যালেঞ্জ, স্যার!

হান ভাঁ মীগেরেঁর এই সদম্ভ ঘোষণা এবং নেদারল্যান্ড পুলিসের সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের খবরটা চাপা রইল না। দুনিয়ার সব কাগজে পরদিন এই বিচিত্র কেচ্ছাটি প্রকাশিত হল। লন্ডন-টাইম্স্ প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে ছেপেছিল:

HE PAINTS FOR HIS LIFE



শিরোনামার নিচে একটি ছবি। জেলখানায় নয়, নিজের স্টুডিওতে পুলিস প্রহরায় তুলি-হাতে হান ভাঁ মীগেরেঁ। শিল্পীর সামনে একটা প্রকাণ্ড ক্যানভাস। তাতে রঙ চাপেনি তখনো। একমাসের মধ্যে ঐ শূন্য ক্যানভাসটা নাকি মন্ত্রবলে হয়ে যাবে নবতম আবিষ্কৃত 'অরিজিনাল' ভেরমিয়ার!

## ।। সাত ।।

— 'অপারেশন মীগেরেঁ'-অভিযানে তুমি আমার সঙ্গে যৌথ-দায়িত্ব নিতে কেন অস্বীকৃত হলে, পঁয়ক্যারে?

পঁয়ক্যারে গাড়ি চালাতে চালাতে তার পার্শ্ববর্তিনীকে এক নজর দেখে নিল। আমাস্টার্ডাম এয়ারটার্মিনালে সে এসেছিল অ্যাগ্নেস্কে রিসিভ করতে । লে লোরেনের ট্রাঙ্ক-টেলিফোনের নির্দেশ পেয়ে। নিজের গাড়িতে এখন মহিলাটিকে নিয়ে চলেছে বিমানবন্দর থেকে শহরের একটি খানদানী হোটেল-এ। বললে, খবরটা তোমার কানে গেল কেমন করে?

—বা:! এখন তো ফিগারো অফিসের প্রতিটি জানলার সার্শি পর্যন্ত সে খবরটা জানে। এ নিয়ে প্রতিটি সেকশান্ নানান মুখরোচক আলোচনায় এখন মুখর।

— মুখরোচক আলোচনা! সেটা কী ধরনের?

— কারও কারও মতে তোমার-আমার মধ্যে নাকি তীব্র রেশারেশি—মুখ দেখাদেখি নেই। দ্বিতীয় দলের মতে অফিসের প্রতিযোগিতার জন্য নয়, তোমার-আমার ঝগড়াটা সম্পূর্ণ অন্য কারণ। তুমি নাকি...

— কী হল? মাঝপথে থেমে গেলে কেন?

— তুমি নাকি আমার কাছে 'প্রপোজ'করেছ, আর আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি।

পঁয়ক্যারে উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে। বলে, ওদের কি কাজকর্ম নেই?

— সে হিসাব আমাদের না করলেও চল্বে। তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নটার জবাব এড়িয়ে গেলে।

— কী প্রশ্ন? ও, হ্যাঁ! কিন্তু কে-বললে যৌথ-দায়িত্ব আমি অস্বীকার করছি? এই তো তোমার জন্য হোটেল কঁতিনেতালে ঘর বুক করেছি, এয়ারপোর্টে এসেছি তোমাকে রিসিভ করতে, নিজের গাড়িতে তোমাকে পৌঁছেও দিচ্ছি । আর তাছাড়া আরও একটা মস্ত দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে আমাকে: হল্যান্ডের চতুঃসীমার ভিতরে তোমার নিরাপত্তা।

— নিরাপত্তা! সেটা আবার কী জাতীয় জন্তু? ইয়োরোপে যুদ্ধ তো অনেকদিন থেমে গেছে! গুলি-গোলা যা চল্‌ছে তা প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে। হল্যান্ডে আমার বিপদ কিসের?

— ও প্রশ্নটা আমিই তোমাকে করব, অ্যাগ্নেস! তুমি এয়ারাপোর্টে আমাকে যে চিঠিখানা দিলে তাতে ডক্টর লোরেন আমাকে সেই নির্দেশই দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, টাইপ করা চিঠির ঐ লাইনটা আন্ডারলাইন করে দিয়েছেন। বিশ্বাস না হয় দেখ, আমার বাঁ-পকেটে রয়েছে।

অ্যাগ্নেস উৎসাহ দেখালো না। 'শ্রাগ্'করল শুধু। ভাবখানা: বৃদ্ধের ভীমরতি ধরেছে।

পঁয়ক্যারে আবার একবার আড়চোখে দেখে নিল তার পার্শ্ববর্তিনীকে। সে জানে, ভালভাবেই জানে—মেয়েটা কী প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে হল্যান্ডে এসেছে। অ্যাগনেস্ 'জিল' কি না তা পঁয়ক্যারে নিশ্চিতভাবে জানে না—কিন্তু এটুকু জানে, ডাচ-সরকার সেই রকম সন্দেহ করে। পঁয়ক্যারে এও জানে যে, অ্যাগনেস জানে না: পঁয়ক্যারে কতটা জানে! সে এবার

বললে, তুমি মাথা ঘুরিও না অ্যাগ্নেস্,. সামনের 'ভিয়ু-ফাইন্ডারে'লক্ষ্য করে দেখ তো—আমাদের ঠিক পিছনেই যে কালো-রঙের মার্সেডিজ-খানা আসছে তার আরোহী দুজনের কাউকে চেন কি না।

নির্দেশ মতো আয়নাটাকে সরিয়ে-নড়িয়ে অ্যাগ্নেস পিছন-গাড়ীর যাত্রী যুগলকে দেখল। দুজনই পুরুষ । ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বয়স। একজনের চোখে কালো চশমা, অপরজনের মোম-দিয়ে পাকানো গোঁফ। কাউকেই চিনতে পারল না। বলল সে কথা।

পঁয়ক্যারে বলে, এয়ারপোর্টে কাস্টমস্ যখন তোমার সুটকেস্ তছনছ করছিল তখন ওরা দুজন দাঁড়িয়েছিল ঠিক তোমার পিছনে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছিল তোমার সুটকেসের ভিতরটা।

অ্যাগ্নেস বলে, হয় তো ওরা দুজন ঐ একই ফ্লাইটে এসেছে। হয় তো 'কিউ'এ ঠিক আমার পিছনেই দাঁড়িয়েছিল ওরা। আর ঐ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখা ? ওটা তোমার সন্দেহবাতিক মনের বিকার।

— না, ওরা একই ফ্লাইটে আসেনি। আমি যখন এয়ারপোর্টে তোমার প্লেনের ল্যান্ডিং-এর জন্য অপেক্ষা করছি তখন ওরা এয়ারপোর্টেই ছিল। আমার মনে হচ্ছে ওরা তোমাকে 'ফলো' করছে!

অ্যাগ্নেসের বুকের ভিতরটা যে ছাঁৎ করে উঠলো মুখে সে ভাবের প্রতিক্রিয়া হল না। বললে, খামোখা আমাকে 'ফলো' করতে যাবে কেন ? আমি কিছু হীরে-জহরৎ স্মাগ্‌ল করে আনিনি! আর দেখেও তো ওদের 'ক্রিমিনাল' বলে মনে হচ্ছে না।

— না 'ক্রিমিনাল'নয়, তবে 'ক্রাইম'-এর সঙ্গে ওদের নিবিড় সম্পর্ক—'ক্রিমিনাল' ধরে বেড়ানো। যে লোকটা গাড়ি চালাচ্ছে তুমি ওকে চেন না, আমি চিনি। ওর নাম : জাঁ ভাঁ যেৎসু। ও ডাচ্-ইন্টেলিজেন্সের একজন দুঁদে গোয়েন্দা! ছোটখাট অপারেশনে ওকে দেখা যায় না—কিন্তু জালে রাঘব-বোয়াল পড়বার সম্ভাবনা থাকলে ওকে ডাকা হয়।

অ্যাগ্নেস স্বাভাবিক হবার জন্য হাতবটুয়া খুলে লিপস্টিকে ঠোঁটটা মেরামত করল কিছুক্ষণ। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললে, তুমি ওকে চিন্‌লে কেমন করে ?

— তুমি জান না, 'ফিগারো'তে চাকরি নেবার আগে আমি 'ডাচ্-ইন্টেলিজেন্সে' ছিলাম ?

— ও হ্যাঁ, তাই তো! সেজন্যই তোমার মাথায় এইসব উদ্ভট চিন্তা! তা বেশ তো, —এস, একটা পরীক্ষা করে দেখা যাক। পরের ক্রসিং-এ 'সিগ্ন্যাল'না দিয়ে তুমি বেমক্কা লেন চেঞ্জ করে পাশের একটা রাস্তায় ঢুকে যাও! দেখা যাক্ পিছনের গাড়িটা কী করে ?

— পুলিসে যদি টিকিট ধরিয়ে দেয় ? ফাইনটা কে দেবে ?

— তুমি! যেহেতু অলীক আশঙ্কাটা তোমার।

— অল রাইট্! তাই করে দেখা যাক।

সামনেই একটা ক্রসিং। কোন সিগ্ন্যাল না দিয়ে নিতান্ত বেআইনীভাবে লেন চেঞ্জ করে পঁয়ক্যারে ঢুকে পড়ল পাশের গলিতে। ওদের আশঙ্কা দেখা গেল অমূলক। পিছনের গাড়ির চালক সোজা বেরিয়ে গেল। এমনকি সামনের গাড়ির এই বেআইনী বাঁক-বাঁদরামোর জন্য প্রত্যাশিত খিস্তিটুকু পর্যন্ত না আউড়েই। দুজনেই লুকিয়ে লক্ষ্য করল সে-গাড়ির নাম্বার প্লেটটা।

অ্যাগ্নেস বললে, দেখলে ? তুমি গোয়েন্দাগিরির চাকরি ছাড়লেও গোয়েন্দাগিরির ভূত তোমার মস্তিষ্কে ছেড়ে যায়নি! রজ্জুতে আজও সর্পভ্রম হয় তোমার!

পঁয়ক্যারে জবাব দিল না। ঘুরপথে ওরা এসে উপনীত হল হোটেল কঁতিনেতাল-এ।



গাড়িটা গেটে-এ গিয়ে থামতেই ছুটে এল হোটেলের পেজ-বয়। কেরিয়ার থেকে অ্যাগ্নেসের সুটকেসটা তুলে নিয়ে যেতে থাকে রিসেপ্শান-কাউন্টারের দিকে। পঁয়ক্যারে তখন গাড়িটা 'পার্কিং-জোন' এ রাখতে ব্যস্ত। ঠিক তখনই নজর হল অ্যাগ্নেসের—হোটেলের অপরদিকে. একটা 'নো-পার্কিং-জোন'-এ, বস্তুত ফায়ার-প্লাগের ধারেই দাঁড়িয়ে আছে একখানা কালো রঙের মার্সেডিজ গাড়ি। গাড়িতে কেউ নেই। নম্বর—হ্যাঁ, যেটা অ্যাগ্নেস্ মনে করে রেখেছে. সেটাই।

ঘর 'বুক' করাই ছিল। সাততলার একটি একক-শয্যাকক্ষ। সাতশ একুশ নম্বর ঘর। সেখানে পৌঁছে পঁয়ক্যারে বললে, এখন বেলা এগারোটা। তুমি বিশ্রাম নাও,লাঞ্চ সারো। আমি বিকাল চারটের সময় আসব। বাধা দিয়ে অ্যাগ্নেস বলে, এটা নিতান্তই আন্-শিভালরাস্ হয়ে যাচ্ছে না পঁয়ক্যারে ? আমি তোমার গেস্ট! আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ সারব, তুমি বিল মেটাবে...

পঁয়ক্যারে খ্যাঁক করে ওঠে, হ্যাং য়োর শিভাল্‌রি! তুমি আমার গেস্ট না হাতি। আমি অফিশিয়াল নির্দেশ মোতাবেক যা করার তাই করছি।

— তার মানে তুমি আমাকে লাঞ্চ্ খাওয়াবে না ?

— না! লাঞ্চ্ নয় আমি এখন ব্যস্ত। অনেক কাজ আছে...

— অকৃতজ্ঞ! অসভ্য! একটি সুন্দরী মহিলার সান্নিধ্যে লাঞ্চ্ খাওয়ার যে আনন্দ...

— কথাটা আমাকে শেষ করতে দাও অ্যাগ্নেস্! আমি বলতে যাচ্ছিলুম, লাঞ্চ্ নয়, ডিনার!

— লা ম্যাগ্নিফিক! লা গ্র্যান্ডি!!

— আরে সবটা শোন প্রথমে! সন্ধ্যা সাতটায় আমাদের দুখানা টিকিট কাটা আছে 'স্টাডস্চৌবার্গ'-এ ( যদি Stadsschouwburg শব্দটার বাংলা রূপান্তর সেটাই হয়); আজ গ্যোয়েতের ফ'স্ট (Faust) আছে । শো শেষ হলে আমরা যাব 'প্যারাডিসো' (Paradiso) —আমস্টার্ডামের সবচেয়ে নাম করা নাইটক্লাব।

— ও বব্! এই মুহূর্তে যদি তুমি 'প্রপোজ' কর, আমি নির্ঘাৎ তা 'অ্যাক্সেপ্ট' করে নেব!

— কিন্তু আমি এই মুহূর্তে আদৌ 'প্রপোজ' করছি না! শোন! আরও কতকগুলো কাজের কথা আছে!

— বল ?

— আমি ঠিক বিকাল চারটের সময় আসব। তুমি তৈরী হয়ে থেক। প্রথমেই তোমাকে নিয়ে যাব একটা 'রেন্ট-আ-কার' শপে। তোমার জন্য একখানা গাড়ি ভাড়া করে দেব একমাসের জন্য। তারপর আমরা যাব 'কাইজারগচ'-এ।

— 'কাইজারগচ' কি একটা ডিপার্টমেন্টাল-স্টোর ? আমাকে মিংক-কোট কিনে দেবে বলে ?

— আজ্ঞে না! 'কাইজারগচ' একটা রাস্তার নাম। যেখানে বাস করেন : ভেরমিয়ার দা সেকেন্ড—অঁরিকুস্ আন্তোনিয়ুস্ ভাঁ মীগেরেঁ।

— উনি এখন পুলিস হাজতে নেই ?

— না,নেই। তুমি কাগজে দেখনি ? উনি নিজের বাড়িতে আজ দিন-কয়েক ধরে আঁকছেন একখানা নতুন 'অরিজিনাল ভেরমিয়ার'। পুলিস প্রহরায় । তার সাক্ষী থাকার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছ একমাত্র তুমি! মীগেরেঁর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ সেরে আমরা বের হব শহর দেখতে। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা অনুরোধ করব। রাখবে ?

— কী বল?

— কোন কারণে যদি তুমি হোটেল ছেড়ে বাইরে যাও তাহলে আমাকে একটা ফোন করে যাবে। আমি না থাকলে আমার ল্যান্ডলেডিকে জানিয়ে যেও— কোথায় যাচ্ছ, কতক্ষণ পরে ফিরবে।

অ্যাগ্নেস বলে,এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না বব্ ? আমি নাবালিকা নই, তুমি ছাড়াও আমস্টার্ডামে আমার বয়-ফ্রেন্ড থাকতে পারে—

পঁয়ক্যারে হঠাৎ ধমকে ওঠে,বারে বারে রসিকতা করে ব্যাপারটাকে চাপা দেবার চেষ্টা কর না অ্যাগ্নেস। তুমি বুঝতে পারছ ব্যাপারটা কতখানি সিরিয়াস্। আমি জানি যে, তুমিও নজর করে গাড়িখানা দেখছ।

— গাড়ি ? কোন গাড়ি ?

— কালো-রঙের মার্সেডিজখানা! যেটা এখন হোটেলের সামনে ফায়ার-প্লাগ আটকে খাড়া করা আছে।

অ্যাগ্নেস্ থম্‌কে গেল। পঁয়ক্যারে একই সুরে বলে গেল, ডক্টর লোরেন আমাকে জানিয়ে রেখেছেন, আমস্টার্ডামে তোমাকে পুলিসে গ্রেপ্তার করবার একটা আশঙ্কা আছে। নিতান্ত বাজে অজুহাতে! তাই প্রথমটা তুমি এই 'অ্যাসাইন্‌মেন্ট'টা নিতে চাওনি।

এবারও অ্যাগ্নেস নীরব রইল। পঁয়ক্যারে বলে, কেন তোমাকে পুলিসে খুঁজছে তা আমি জানি না, জানতে চাইও না। কিন্তু আমার নির্দেশ মেনে না চললে তো আমি তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে পারব না, অ্যাগ্নেস। অ্যাগ্নেস অনেকক্ষণ নীরবে কী-যেন ভাবল। তারপর মুখ তুলে ওর চোখে চোখে তাকিয়ে বললে, থ্যাঙ্কস্ বব্! হ্যাঁ, একটা জটিলতা আছে বটে আমার। কিন্তু সে-সব কথা আমি বলতে পারব না। আমি অপরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ডক্টর লোরেন পীড়াপীড়ি না করলে আমি সত্যই এই 'অ্যাসাইনমেন্ট'টা নিতাম না!...ঠিক আছে! কথা দিচ্ছি, হোটেল ছেড়ে যদি বাইরে যাই তাহলে তোমাকে জানিয়ে যাব।

— ধন্যবাদ অ্যাগ্নেস! তাহলে আর একটা কথাও বলি : বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, ঐ কালো গাড়িটার লোক আগেভাগেই জানত যে, তোমার জন্য আমি হোটেল কঁতিনেতাল-এ ঘর ভাড়া করেছি। তাই আমরা যখন বেআইনী বাঁক নিয়ে পাশ কাটালাম তখন ওরা আমাদের অনুসরণ করেনি। সোজা এখানে এসে অপেক্ষা করেছে। ওরা এয়ারোড্রামে গিয়েছিল অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে, বোধ করি কাস্টম্‌স্-এর উপর নির্দেশ দেওয়াই ছিল—তোমার মালপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার। না হলে যে-ভাবে ওরা তোমার মালপত্র তছ্‌নছ করল তা সচরাচর কোন সাংবাদিকের ক্ষেত্রে করা হয় না।

— ঠিক কথা। সাংবাদিক হিসাবে আমারও সেই রকম অভিজ্ঞতা।

— ওরা কি তোমার সুটকেসে বিশেষ কিছু একটা খুঁজছিল?

— মাপ কর পঁয়ক্যারে, তোমার এ-প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।

—ঠিক আছে। আরও একটা প্রস্তাব : তুমি কি হোটেলটা বদ্‌লাতে চাও?

— লাভ নেই। ওরা টের পাবেই।

— কিন্তু ধর, তুমি যদি আমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ওঠ? আমার অবশ্য এক-কামরার ব্যাচিলার্স অ্যাপার্টমেন্ট; কিন্তু আমি 'কিচেনেট'-এ শুতে পারি।



এতক্ষণ যে মেয়েটি ক্রমাগত প্রগল্‌ভতা করছিল এবার সুযোগ পেয়েও সে কোন রসিকতা করল না। বলল, আমাকে একটু ভাববার সময় দাও। ঠিক আছে চারটের আগে আমি কোথাও যাব না। তুমি এলে এবিষয়ে কথা হবে।

— তোমার লাঞ্চের কী হবে?

— খাবার ঘরে আনিয়ে নেব।

পঁয়ক্যারে বিদায় নিয়ে চলে গেল। অ্যাগ্নেস তার জিনিসপত্র মোটামুটি গুছিয়ে নিল। টেলিফোনে অর্ডার দিল কিছু খাবার ওর ঘরে পাঠিয়ে দিতে। তারপর স্নান করে তৈরী হয়ে নিল। ওর ঘরটা রাস্তার দিকে। উঠে গিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে এসে ইতিমধ্যে বারকতক দেখেছে 'নো পার্কিং জোনে' গাড়িটা যথারীতি দাঁড়িয়ে আছে!

হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোনটা। নিশ্চয় পঁয়ক্যারে। এ শহরে আর কেউ তো জানে না সে কোন হোটেলে উঠেছে। রিসিভার তুলতেই শুনতে পেল রিসেপ্‌শন-কাউন্টারের মেয়েটি বলছে, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। তাঁকে কি পাঠিয়ে দেব?

— ভদ্রলোক ? কী নাম? আচ্ছা টেলিফোনটা তাঁকে দিন প্রথমে। বোঝা গেল ও-প্রান্তে টেলিফোন-রিসিভারটা হাত বদলালো। এবার একটি পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, শুভ-প্রভাত মাদাম শ্যাম্পেন। নাম শুনে তো আমাকে চিনতে পারবেন না। আমার নাম : ইয়ানো নাকামুরা।

নামটি নিঃসন্দেহে জাপানী। তখনো জাপান মিত্রপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধরত। কিন্তু এসব কথা তো টেলিফোনে বলা যায় না। অ্যাগ্নেস বললে, না, নাম শুনে চিনতে পারছি না। আমাদের কি কখনো দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে?

— হয়েছে! নয়-বছর আগে। মাত্র পাঁচ-মিনিটের জন্য ব্যাটাভিয়া বন্দরে। আমি কি আপনার পাঁচ-মিনিট সময় নষ্ট করতে পারি?

অ্যাগ্নেস রীতিমতো অবাক হল। বললে, প্রয়োজনটা কিসের? কী চান আপনি?

— আপনি আমাকে 'প্লেস' করতে পেরেছেন তো? আপনি সেবার আমাকে একটা দশ-ডলারের ভাঙানি দিয়েছিলেন, আর আমি ভুল করে আপনার অ্যাটাচি-কেসটা নিয়ে এসেছিলাম।

অ্যাগ্নেস বিস্মিত হয়েছে যতটা সতর্ক হয়েছে তার চতুর্গুণ! বললে, খুব সম্ভবত আপনি অন্য কোন মহিলার সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছেন। এমন কোন ঘটনার কথা তো আমার মনেই পড়ছে না।

— ঠিক আছে। হয়তো সাক্ষাতে মনে পড়বে। ভুল হলে আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ফিরে আসব। আমি কি পাঁচ-মিনিটের জন্য আপনার ঘরে আসতে পারি?

মনস্থির করল অ্যাগনেস। বললে, ঠিক আছে। আসুন।

লাইন কেটে দিয়ে আবার জানলার ধারে সরে এল। পর্দার আড়াল থেকে দেখল—না, সেই কালো-রঙের মার্সেডিস্ গাড়িখানা ওখানে নেই। কিন্তু লোকটা কে? সত্যিই সেই জাপানী ভদ্রলোক? ব্যাটাভিয়া বন্দরে যার সঙ্গে জীবনে একবার মাত্র দেখা হয়েছিল, ন-দশ বছর আগে? যদি তা না হয়? যদি এইভাবে শত্রুপক্ষ মায়াজাল বিস্তারের প্রচেষ্টা করতে থাকে? আবদুল মহম্মদের সেই গচ্ছিতসম্পদ—জ্যাকের বুকের পাঁজর ক-খানা হাতিয়ে নেবার জন্যই যদি ফাঁদ পেতে থাকে? দু-চোখ বুঁজে দশ বছর আগে দেখা সেই জাপানী ভদ্রলোকের চেহারাটা মনে করবার চেষ্টা করতে থাকে। মিনিট-পাঁচেক পরে বেজে উঠল কল-বেল। দরজা খুলেই

স্তম্ভিত হয়ে গেল অ্যাগ্নেস!
করিডোরে যে খর্বকায় জাপানী ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর পোশাকটায়।
গ্রে-রঙের সুট, গলায় লাল-রঙের টাই, তাতে পোখরাজ-বসানো টাইপিন! হাতে একটি ছোট ব্রীফকেস, হুবহু যেমনটি ছিল সেবার। কিন্তু এ ভদ্রলোকের বয়স যেন কিছু বেশি। বা:! তা তো হবেই! দশ-দশটা বছর কেটে গেছে না ইতিমধ্যে?
— আসুন, ভিতরে এসে বসুন ।
ভদ্রলোক মাজা ভেঙে জাপানী কায়দায় 'আরিগাতো'করলেন। হ্যাট-র‍্যাকে টুপিটা টাঙিয়ে এসে বসলেন একটি চেয়ারে। হাতের সুটকেসটা খুলে মেলে ধরলেন এবার। বললেন, দেখে নিন। আপনার জিনিস কি না।
অ্যাগ্নেস বিনাবাক্যব্যয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখল। কিছু কস্‌মেটিক, ব্র্যাসিয়ার, প্যান্টি, তোয়ালে, টুথব্রাশ, পেস্ট। একটা ক্রাইম থ্রিলার।
বললে, না। একটাও আমার নয়। আমি চিনতে পারছি না।
— সেটাই স্বাভাবিক । এগুলো তো আপনি কেনেননি,কিনেছিল আবদুল মহম্মদ। আপনি চিনবেন কোত্থেকে?
কুঞ্চিত-ভ্রুভঙ্গে অ্যাগ্নেস বললে, আপনি আদ্যন্ত ভুল করেছেন মসুঁয়ে। আবদুল মহম্মদ নামে কাউকে আমি চিনি না।
বিচিত্র হেসে ভদ্রলোক বললেন, আমাকেও চিন্‌তে পারছেন না?
— না !
— আমার এই পোশাকটা সত্ত্বেও ?
— পোশাক ! কী পোশাক ?
— এই গ্রে-রঙের থ্রি-পিস্‌ সুট, লালরঙের টাই, পোখরাজ-বসানো টাইপিন?
— কী আবোল-তাবোল বকছেন আপনি! সবার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন দেখি: আপনার নাম ইয়ানো নাকামুরা। আপনি কি জাপানী?
— আমার চেহারা দেখলে তাই মনে হয়। আমার বাবা ও মা দুজনেই জাপানী ছিলেন। কিন্তু আমি হল্যান্ডের নাগরিক। বিশ্বযুদ্ধ বাধবার আগে থেকেই। পাসপোর্টটা দেখবেন ?
— ও! কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন বলুন তো—ব্যাটাভিয়া-বন্দরে যে মেয়েটির সঙ্গে আপনার সুটকেস বদল হয়ে গেছিল সে আজ এই হোটেলে আছে?
— কেন ? আবদুল তো আপনাকে জানিয়ে রেখেছিল। আপনি তো জানেন—আপনি পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তেই যান, আমাদের নজরের বাইরে যেতে পারবেন না। বলেনি?
— কে? ঐ আবদুল? তাকে তো মনেই করতে পারছি না আমি।
— স্বাভাবিক! খুবই স্বাভাবিক! কাউন্টার-এস্পায়োনেজ্‌কে রুখতে আপনাকে এভাবেই কথা বলতে হবে। আপনি কি আবদুলের সঙ্গে নিজে একবার কথা বলবেন?
— সে কি আমস্টার্ডামে? —সোৎসাহে কথাটা উচ্চারণ করেই মনে মনে জিব কাটল অ্যাগ্নেস। যতটা সম্ভব শুধ্‌রে নিতে যোগ করে—আই মীন, আপনার সেই হাইপথেটিক্যাল আবদুল?
ভদ্রলোক নিঃশব্দে এগিয়ে এলেন। তুলে নিলেন টেলিফোন রিসিভারটা। একটা বাইরের নম্বর ডায়াল করে একটু পরে কার সঙ্গে যেন আলাপচারী শুরু করলেন, রহিম? হ্যাঁ, আমি হোটেল



কঁতিনেতাল থেকে বলছি..হ্যাঁ হ্যাঁ সেই সাতশ একুশ নম্বর ঘর থেকেই..না, পারছেন না, চিনতে পারছেন না, অন্তত মুখে তো তাই বলছেন...ঠিক আছে, কথা বল...
টেলিফোন রিসিভারটা এবার বাড়িয়ে ধরে বললে, নিন্,কথা বলুন।
— কার সঙ্গে? রহিম লোকটা কে ?
— আপনি যাকে আবদুল মহম্মদ নামে চেনেন, স্বীকার করছেন না। ও এখানে আন্ডার-গ্রাউন্ডে আছে তো। এখানে ওর নাম : রহিম।
অ্যাগ্নেস সাবধানে টেলিফোনের কথা-মুখে বললে, অ্যাগ্নেস শ্যাম্পেন... ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় জবাব ভেসে এল, জিলা! ওঃ! কত যুগ-যুগান্ত পরে তোমার সঙ্গে কথা বল্‌ছি। মনে হচ্ছে আমার সেই হারিয়ে-যাওয়া ছোট বোনের সঙ্গেই কথা বল্‌ছি...
— ছোট বোন ! কে আপনার ছোট বোন ?
— আমার কাজিন, জিল-বহিন, যার পাস্‌পোর্টে..যাক ওসব ফালতু কথা। শোন, ভাল করে শোন..বেশি কথা বলা যাবে না..বুঝতেই পারছ, লাইন ট্যাপ হতে পারে।..কিন্তু তুমি বোকার মতো সব কিছু অস্বীকার করছ কেন ..না! আমিই ভুল করছি! তুমি বুদ্ধিমতীর মতোই অস্বীকার করেছ। শোন : নাকামুরাকে বল—সেই আধখানা ছেঁড়া ভাউচারটা দেখাতে। সেটাই তো ছিল অন্তিম সনাক্তিকরণ চিহ্ন! সেই ব্যাটাভিয়া-বন্দরের লাল-ড্র্যাগন রেস্তোরাঁর বিল ভাউচার। বাকি আধখানা ভাউচার তোমার কাছে আছে নিশ্চয়ই..
— না নেই! —বলেই আবার সামলে নিল, আই মীন, কোন রেস্তোরাঁর আধখানা বিল-ভাউচার আমার কাছে নেই!
— সেটা পারীতে রেখে এসেছ ?
এবার আর ভুল করল না অ্যাগ্নেস। বললে, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না!
— গুড গার্ল! শোন : তোমার কাছে যে অংশটা ছিল, মনে আছে নিশ্চয় তাতে ছিল বিলের 'রোপেয়া'র অঙ্কটা। আর আমার কাছে 'লাল ড্রাগন' রেস্তোরাঁর, ছাপা নাম, বিলের নম্বর আর তারিখ। পাসপোর্টটা নিশ্চয় সঙ্গে আছে— পারীতে রেখে আসতে পার না সেটা। অন্তত তারিখটা মিলিয়ে নিও ফাইলটা হস্তান্তরিত করার আগে। দাও.এবার টেলিফোন রিসিভারটা নাকামুরাকে দাও।
যন্ত্রচালিতের মতো অ্যাগ্নেস যন্ত্রটা বাড়িয়ে ধরল জাপানী ভদ্রলোকের কাছে। নাকামুরা নির্দেশ শুনে নিয়ে টেলিফোনে বললে, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ছেঁড়া-কাগজটা তো? হ্যাঁ, দেখাচ্ছি ওঁকে। দাইবৎসুই জানেন, সেটা দেখলে পরে তাঁর বিশ্বাস হবে কি না—
টেলিফোনটা টেবিলে নামিয়ে রেখে নাকামুরা তার ওয়ালেট বার করল কোটের বুক-পকেট থেকে। নিঃশব্দে বাড়িয়ে ধরল একখণ্ড জীর্ণ দ্বিখণ্ডিত কাগজ।
হ্যাঁ, সেটা ব্যাটাভিয়ার কোন এক লাল-ড্রাগন রেস্তোরাঁর নামাঙ্কিত বিল-ভাউচারের অর্ধাংশ। ছাপানো কাগজ। তারিখটা পড়া যাচ্ছে, যদিও কালিটা ম্লান হয়ে এসেছে ন-দশ বছরে। পাসপোর্ট-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন হল না। ব্যাটাভিয়া-বন্দর ত্যাগ করার চিহ্নিত তারিখটা স্পষ্টই মনে আছে ওর। এতক্ষণে সে নিশ্চিন্ত হল। টেলিফোন-রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললে, আবদুল!
— শাট আপ্!

— সরি! রহিম! তোমার সঙ্গে কি একবার দেখা হতে পারে না? সেটা কি নিতান্তই অসম্ভব?
অসম্ভব হয় তো নয়,কিন্তু খুবই বিপজ্জনক। শুধু শুধু বিপদের ঝুঁকি কেন নিতে যাবে বহিন্?
— একবার, একটি বার তোমার সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসব।
ও প্রান্তবাসী অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললে, ঠিক আছে, টেলিফোনটা নাকামুরাকে দাও।
নাকামুরা ওর নির্দেশ শুনে টেবিলে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরে উঁকি মেরে কী যেন খুঁজল। তারপর ফিরে এসে টেলিফোনের কথামুখে বললে, না, কোন কালো রঙের মার্সেডিজ গাড়ি হোটেলের সামনে নেই।
এরপর সে টেলিফোনটা রিসিভারে নামিয়ে রেখে বললে,ঠিক আছে ম্যাডাম, আমি আপনাকে আবদুল, মানে রহিমের কাছে নিয়ে যাব। তার আগে বলুন, ফাইলটা কি আপনি পারীতে রেখে এসেছেন?
— হ্যাঁ।
— কোথায়? বাড়িতে না ব্যাঙ্ক-ভল্টে?
— না। আমার অফিসের ড্রয়ারে।
— তার চাবি কি আপনার কাছে?
— হ্যাঁ।
— আপনি তাহলে এক কাজ করুন। চাবিটা দিন। আর আপনার ঐ 'ফিগারো' কাগজের লেটার-হেড-এ আমাকে 'অথরাইজ'করে একটি চিঠি দিন, যাতে আপনাদের সেক্শানাল ইনচার্জ আমাকে ফাইলটা নিয়ে আসতে দেয়। তাকে বলুন যে, ঐ ড্রয়ারে আপনার কিছু জরুরী কাগজপত্র আছে, সেগুলো ঐ 'অপারেশন মীগেরেঁ'তে প্রয়োজন, আপনি ভুলে ফেলে রেখে এসেছেন।
অ্যাগ্নেসের সব সন্দেহ,সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ততক্ষণে নির্মূল হয়েছে। নিশ্চিন্ত হয়েছে সেও এতদিনে—ভারমুক্ত হওয়ায়। জ্যাকের বুকের পাঁজর-গুঁড়িয়ে বানানো সেই ফাইলটার জগদ্দল বোঝা আর ওকে বয়ে বেড়াতে হবে না। নিশ্চিন্ত মনে সে লেটার-হেড প্যাডের কাগজে ওর সেক্শানাল ইনচার্জকে চিঠিখানা লিখে দিল : পত্রবাহককে সে তার লকারের চাবিটা দিয়ে পারীতে পাঠিয়ে দিচ্ছে কিছু জরুরী কাগজপত্র নিয়ে আসতে।
চিঠিখানা নাকামুরার হাতে দিয়ে প্রশ্ন করে, রহিমের সঙ্গে দেখা করে ফিরতে কতক্ষণ লাগবে? বিকাল চারটেয় আমার একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। নাকামুরা ঘড়ি দেখে বললে, তিনটের আগেই আমরা ফিরে আসতে পারব। ঠিক তখনই ডোর-বেলটা বেজে উঠল। নাকামুরা চট করে ঢুকে গেল বাথরুমে। অ্যাগ্নেস দরজা খুলে দিতেই হোটেল-বয় ঢুকল খাবারের প্লেট হাতে। টেবিলে সব কিছু সাজিয়ে দিয়ে বিল সই করিয়ে সে চলে গেল। তৎক্ষণাৎ বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। বললে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন।
— না থাক। চলুন,এখনি বেরিয়ে পড়ি। কে জানে, আবার হয়তো সেই কালো গাড়িটা এসে পড়বে।
— ঠিক আছে। তাই চলুন তবে।
মধ্যাহ্ন আহার অস্পর্শিত রেখে যেমন ছিল তেমনিই বেরিয়ে এল। কাউন্টারে ঘরের চাবিটা জমা দেবার সময় ওর হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা। বব্-এর সেই নির্দেশটা। কিন্তু এটা এমন একটা ব্যাপার যে, বব্কে জানানো চলে না। আর তাছাড়া সে তো তিনটের মধ্যেই ফিরে



আসছে। বব্ টের পাবে কী করে?

বব্ পঁয়ক্যারে যখন হোটেল কঁতিনেতালে এসে পৌঁছালো তখন চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি। অভ্যাসবশে নজর গেল রাস্তার বিপরীতে সেই নো-পার্কিং জোনটায়। না, কালো রঙের মার্সেডিজ্টা নেই।
রীতিমতো অবাক হল সে,যখন দেখা গেল অ্যাগ্নেস তার ঘরে নেই। নিজের বাড়িতে টেলিফোন করল। না, সেখানে কোন মেসেজ রেখে যায়নি অ্যাগ্নেস।
কাউন্টারে গিয়ে মেয়েটিকে প্রশ্ন করে, সাতশ একুশ নম্বর পিজন-হোলটা দেখুন তো, কোনও মেসেজ আছে কি?
মেয়েটি অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বললে,আপনার চাবিটা দেখাবেন কাইন্ডলি?
— না, আমি আপনাদের বোর্ডার নই। ঐ ঘরটা বুক করেছেন মিসেস্ অ্যাগ্নেস্ শ্যাম্পেন। আমার সঙ্গে তাঁর একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল বিকাল চারটেয়। অথচ তিনি ঘরে নেই। তাই জানতে চাইছি, আমার নামে কোন মেসেজ রেখে গেছেন কি?
মেয়েটি পায়রা-খোপটা দেখে নিয়ে বললে, সরি। না, কোন চিঠি নেই।
পঁয়ক্যারে লাউঞ্জে গিয়ে বসল একটি সোফায়। ওর হাতঘড়ি টিক্টিক্ করে এগিয়ে চলেছে। সাড়ে, চার, পাঁচ, ছয়। অ্যাগ্নেস এখনো ফিরল না। আবার উঠে এল সে। মেয়েটিকে বললে, দেখুন, আমার নাম বব্ পঁয়ক্যারে, অ্যাগ্নেস আর আমি, আমরা দুজনেই পারীর ফিগারো পত্রিকার সংবাদদাতা, আপনি কি চাবিটা আমাকে দেবেন? ঘরটা আমি দেখে আসতাম তাহলে। কথা শেষ করে সে তার প্রেস-কার্ডটা বাড়িয়ে ধরে।
মেয়ে বললে, দুঃখিত । এটা বেআইনি। বোর্ডারের অনুপস্থিতিতে আপনাকে তাঁর ঘরে ঢুকতে দেওয়া।
পঁয়কারে বললে,আপনার ডিউটি কখন শেষ হচ্ছে?
— সাড়ে ছয়টায় । অর্থাৎ এখনই।
— সন্ধ্যায় আপনার কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?
মেয়েটি হাসল বলল, আছে। আমার বয়-ফ্রেন্ড আমাকে নিতে আসবে। কেন বলুন তো?
পঁয়ক্যারে পকেট থেকে দুখানি টিকিট বার করে বললে, আমার একটি উপকার করবেন? অ্যাগ্নেসকে নিয়ে যাব বলে দু'খানা অপেরার টিকিট কেটেছিলাম। আপনারা দুজনে যদি দেখতে যান তাহলে টিকিট-দুটো নষ্ট হয় না। এটা আমার উপহার।
মেয়েটি অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে টিকিট দুটো নিল। বললে, ঠিক আছে, আমি একজন 'বয়'কে সঙ্গে দিচ্ছি। তার উপস্থিতিতে ঘর খুলে আপনি দেখে আসুন। সেখানে কোন মেসেজ নিশ্চয় রাখা নেই। যা হোক, আপনি ঘরটা দেখে আসতে পারেন।
হোটেল-বয় ঘরের চাবি খুলে দিল। পঁয়ক্যারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিল সব কিছু। দুটো জিনিসে খট্কা লাগল তার। টেবিলের উপর নিপুণভাবে সাজানো আছে আহার্য। অস্পর্শিত । অর্থাৎ অ্যাগ্নেস খাবারের অর্ডার দিয়েছিল, খায়নি। দ্বিতীয়ত ওর বিছানায় পড়ে আছে একটা ছোট অ্যাটাচি কেস—যেটা সে পারী থেকে নিয়ে আসেনি। চাবি দেওয়া নেই তাতে। খুলে ভিতরের জিনিস পরীক্ষা করল। প্রসাধনদ্রব্য, টুথব্রাশ, পেস্ট, জামা, ব্র্যাসিয়ার। ব্র্যাসিয়ারটা তুলে পরীক্ষা

করে দেখল—খুব ছোট ছোট অক্ষরে এমব্রয়ডারি করে একটা ট্যাগ লাগানো আছে। আমস্টার্ডামের একটি বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের। অ্যাগ্নেস কখন আমস্টার্ডাম থেকে এটা কিনল? সে নিজেই কিনেছে নিশ্চয়। ব্র্যাসিয়ার কেউ কাউকে উপহার দেয় না। কিন্তু কখন কিনল অ্যাগ্নেস? দ্বিতীয়ত, ঐ বইখানা : ঐ ক্রাইম থ্রিলারখানা? কেমন করে কিনল?

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল হোটেলের বয়টা দাঁড়িয়ে আছে পিছনে। সে নিজে থেকেই বলল, ম্যাডাম না খেয়েই বেরিয়েছেন দেখছি।

— হ্যাঁ, কিন্তু এমনও হতে পারে যে, সে বেরিয়ে যাবার পরে খাবারটা এসেছে।

— না, মঁস্যুয়ে। রুম কুড়ি থেকে চল্লিশ আমার এক্তিয়ারে। খাবারটা আমি নিজেই পৌঁছে দিয়ে গেছি!

— তাই নাকি? কটার সময় বল তো?

— সওয়া বারোটা নাগাদ।

— তখন কি সে ঘরে একা ছিল?

ছেলেটা বিচিত্র হাসল। বল্ল, আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু একটা বিসদৃশ জিনিস আমার নজরে পড়েছিল মস্যুয়ে। হ্যাট-র‍্যাকে, ঠিক এইখানটায়, একটা পুরুষের টুপি ঝুলছিল!

— পুরুষের টুপি? তুমি ঠিক দেখেছ?

— ঠিকই দেখেছি। শুধু তাই নয়, ম্যাডাম যখন লিফ্‌টে করে নামছেন তখন সেই টুপির মালিককেও দেখেছি। লোকটা নির্ঘাৎ জাপানী।

— জাপানী! কী বল্‌ছ তুমি!

যদিও মাত্র একনজর দেখেছে তবু ছোকরা নিখুঁত বর্ণনা দিল লোকটার। ঐ জাপানী প্রৌঢ় মানুষটার।

— কখন বের হল ওরা?

— ধরুন বারোটা কুড়ি। আমি এ-ঘরে খাবারটা রেখে যাবার পরেই।

পঁয়ক্যারে ওকে ভালরকম টিপ্‌স্ দিল।

নিচে নেলে এসে দেখে কাউন্টারে বসে আছে অন্য একটি মহিলা।

পঁয়ক্যারে পুনরায় লাউঞ্জে গিয়ে বসে। সাতটা, সাড়ে-সাত, আট, নয়! কী হতে পারে? আমস্টার্ডামে কোথা থেকে এসে আবির্ভূত হল একজন জাপানী? কেনই বা এল সে? কেমন করে খোঁজ পেল এই হোটেলের সাতশ একুশ নম্বর ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছে অ্যাগ্নেস শ্যাম্পেন? আর সবচেয়ে বড় কথা—ঐ অজানা-অচেনা লোকটার সঙ্গে কোন সাহসে অ্যাগ্নেস বেরিয়ে গেল অপরিচিত আমস্টার্ডাম শহরের পথে? ওকে কোনও খবর না দিয়েই?

হঠাৎ যেন টের পেল বব পঁয়ক্যারে—ঐ মেয়েটিকে সে ভালবেসে ফেলেছে। একই অফিসে কাজ করে ওরা। চেনা-জানা অনেকদিনের। অনেক মিটিং এ দুজনে একসঙ্গে উপস্থিত থেকেছে। মেয়েটার চোখে-মুখে কথা। 'লেগ্‌-পুলিং'করতে পারলে আর কিছুই চায় না। মেয়েটির প্রতি ওর মনের কোণায় যে অন্তর্লীন অনুভূতিটা তিল তিল করে জমে উঠেছিল আজ তার স্বরূপটা বোঝা গেল মেয়েটিকে হারিয়ে। অ্যাগ্নেস নিজের দায়িত্ব নিজেই বইতে পারে—সে 'জিল' কি না তা জানা নেই, কিন্তু তার বিগত জীবনের নেপথ্যে আছে কিছু দুর্জ্ঞেয় রহস্য, যাতে আমস্টার্ডাম পুলিস তার উপর নজর রেখেছে। পঁয়ক্যারে তাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিল। সেখানে ঘা খেয়েই ওর পৌরুষ আহত হয়েছে। কিন্তু সে কী করতে পারে? অ্যাগ্নেস যদি ওর কথা না শোনে..



একটা পাব্‌লিক টেলিফোন বুথ থেকে সে সরাসরি টেলিফোন করল আমস্টার্ডাম পুলিসের খোদ বড় কর্তাকে, কমিশনার ডি-ভেল্‌ডিকে। আত্ম-পরিচয় দিয়ে সে জানালো—কমিশনারের অনুমতি পেয়ে ফিগারো সম্পাদক একজন মহিলা সাংবাদিককে এই শহরে পাঠিয়েছিলেন : মাদাম অ্যাগ্নেস শ্যাম্পেন। আর সেই মেয়েটি তার হোটেল থেকে আজ দুপুরে বেমক্কা হারিয়ে গেছে।

ডি-ভেল্‌ডি ধৈর্য ধরে সব কিছু শুনলেন। তারপর বললেন,কিছু মনে করবেন না মঁস্যিয়ে পঁয়ক্যারে,কিন্তু এমনও তো হতে পারে তিনি তাঁর কোনও বয়-ফ্রেন্ডের সঙ্গে...

— না পারে না! আমি অ্যাগ্নেসকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনি। আমস্টার্ডামে তার পরিচিত কোন বন্ধু নেই। আমি প্রায় নিশ্চিত—এটা একটা 'অ্যাব্‌ডাক্‌শান'এর কেস। নারী অপহরণ।

— তা কেমন করে সম্ভব? হোটেল কঁতিনেতাল একটা খানদানী হোটেল। সেখান থেকে দিন-দুপুরে কোনও মহিলাকে অপহরণ করা সম্ভবপর নয়, যদি না মহিলাটি স্বেচ্ছায় পথে নামেন!

— অ্যাগ্নেস শ্যাম্পেনকে পুলিসে গ্রেপ্তার করেনি নিশ্চয়?

— মঁস্যিয়ে পঁয়ক্যারে! আপনি একটি দায়িত্বশীল পত্রিকার সাংবাদিক। আপনার জানা থাকা উচিত যে, হোটেলের ঘর থেকে কোন বোর্ডারকে গ্রেপ্তার করলে সেটা হোটেলের ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে করতে হয়। তাছাড়া মিসেস্ শ্যাম্পেন ফরাসী নাগরিক—ব্যাপারটা ফ্রেঞ্চ এম্ব্যাসীকেও জানাতে হয়।

— আপনি আমাকে তাহলে কী পরামর্শ দিচ্ছেন?

— দুটি বিকল্প পরামর্শ। বেছে নেবেন আপনিই। প্রথম কথা, আজ রাত্রিটা অপেক্ষা করুন। কাল সকালেও তিনি যদি ফিরে না আসেন তবে বুঝতে হবে যে, তিনি কোনও নাইট-ক্লাবে গিয়ে বেএক্তিয়ার হয়ে পড়েননি।

দ্বিতীয়ত, যদি আপনি সন্দেহ করেন যে, এটা একটা 'অ্যাবডাকশান' কেস্, তাহলে লোকাল পুলিস-স্টেশনে একটা প্রাথমিক এজাহার দিয়ে রাখুন এবং ফ্রেঞ্চ এম্ব্যাসীকে জানিয়ে রাখুন। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন—পুলিস-কমিশনারের পক্ষে প্রতিটি রমণীর রাত্রিবাসের হক-হদিস্ জানা সম্ভব নয়।

টেলিফোন লাইন কেটে দিয়ে পঁয়ক্যারে যে পদক্ষেপটা করল সেটা কমিশনার সাহেবের পরামর্শ মোতাবেক নয়। সে থানা অথবা ফ্রেঞ্চ-এম্ব্যাসীতে ফোন করল না। একটা ট্রাঙ্ককল 'বুক' করল পারীতে। রাত তখন এগারোটা। তবু বৃদ্ধ সম্পাদকমশাইকে তাঁর দপ্তরেই পাওয়া গেল। আদ্যোপান্ত সবটা শুনে লে লোরেন বললেন, এ ওঠ্‌শাহী কিস্তিটা আমার নজরে পড়েনি!

— আজ্ঞে?

— ও-পক্ষ যে এমন একটা চাল দিতে পারে তা আমি আন্দাজ করিনি।

— আমি স্যার, ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা। কোন পক্ষের কথা বলছেন?

— 'পক্ষ' তো একটাই। কৃষ্ণপক্ষ এখন জাপানী অকুপেশনে। শুক্লপক্ষের কথাই বলছি। 'অ্যারেস্ট' করলে নানান জবাবদিহি, তার চেয়ে 'অ্যাব্‌ডাক্‌শান'টার আয়োজন করা সহজ! সাপও মরল, লাঠিটাও ভাঙল না। কিন্তু কুইন অফ্ হার্টস্ নিয়ে ওরা করবেটা কী? ট্রাম্পের

টেক্কাটাতো আমার আস্তিনের তলায় !
পঁয়ক্যারে দ্বিতীয়বার বলল না যে, কথোপকথন তার মগজে ঢুকছে না। বলে, আমি কী করব ?
— শোন ! কাল সকালের ফ্লাইটে একজন স্পেশাল মেসেঞ্জার যাচ্ছে। সীলবদ্ধ খামটা খুলে চিঠিখানা পড়বে। দ্বিতীয় একখানা খামে চিঠিটা সীলবদ্ধ করে প্রাপককে হস্তান্তরিত করবে। পার্সোনালি। এনি কোশ্চেন ?
— লোকাল পুলিস স্টেশনে জানাব না ?
— বোকার মত প্রশ্ন হল এটা, আর কিছু ?
— ফ্রেঞ্চ এম্ব্যাসীকে ?
— প্রয়োজন হবে না। ওঠ্‌শাহী কিস্তিটা চাপা দিতে আমি যে পাগলা ঘোড়াটাকে ঠেলে দেব তাতেই মাৎ হবে ওরা। মাৎ না হলেও কাৎ হবে !
— ঠিক আছে স্যার,কালকে আপনাকে টেলিফোন করে জানাব, কী ডেভেলপমেন্ট হল।
— কাল আমাকে পারীতে পাবে থোড়াই। কাল সকালের ফ্লাইটেই আমি লন্ডন যাচ্ছি। তবে অ্যাগ্‌নেস সম্বন্ধে চিন্তার কিছু নেই। কাল সন্ধ্যার মধ্যেই ওরা 'পিতা-পিতা' ডাকতে ডাকতে ফিগারোর সাংবাদিককে তার হোটেলে পৌঁছে দেবে !
তাই দিল। ঠিক সন্ধ্যার মধ্যেই অবশ্য নয়। এবং 'পিতা-পিতা'বল্‌তে বল্‌তে কিনা তাও জানি না।
রাত দশটায় টেলিফোনটা বেজে উঠল পঁয়ক্যারের ঘরে। সেটা তুলে নিতেই শোনা গেল অ্যাগ্‌নেসের আতঙ্কতাড়িত কণ্ঠস্বর : বব্‌! তুমি একবার আসতে পারবে ?
— অ্যাগ্‌নেস ! তুমি ? কোথা থেকে কথা বলছ ?
— হোটেল কঁতিনেতাল থেকেই। এইমাত্র ওরা আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল।
— ওরা ! ওরা কারা ?
— আমার আমার ভীষণ ভয় করছে ! তুমি একবার আসতে পারবে ?
— শ্যিওর ! তুমি ভাল আছ তো ?
— শারীরিক আছি। এলে কথা হবে।

হোটেল কঁতিনেতালে অ্যাগ্‌নেসের মুখোমুখি বসে পঁয়ক্যারে জানতে চায়, এবার খুলে বল তো, কোথায় ছিলে সারাটা দিনরাত ? আমাকে না বলে পালিয়েই বা গেলে কেন ?
অ্যাগ্‌নেস অধোবদনে বললে, কিছু মনে কর না বব্‌, সব কথা তোমাকে বলা যাবে না। বাধা আছে—
— হ্যাং য়োর বাধা ! আগে বল : ঐ জাপানী লোকটা কে ? ওকে আগে থেকেই চিনতে ?
অ্যাগ্‌নেস অবাক হল। বব্‌ কেমন করে জানল যে, সে একজন জাপানীর সঙ্গে হোটেল ছেড়ে বার হয়েছে ? কিন্তু সে-প্রশ্ন করল না। প্রাক্তন-গোয়েন্দা বব্‌ জেনেছে নিশ্চয় কোন সূত্রে। তাই বললে, চিনতাম। উনি বিশ্বস্ত ব্যক্তি !
— হ্যাং য়োর বিশ্বস্ত-ব্যক্তি !একটা হাড়-হাভাতে বজ্জাৎ জ্যাপ্‌ !
— অমন করে ব'লনা বব্‌ ! ভদ্রলোক শহীদ হয়েছেন। প্রাণ দিয়েছেন একটা মহৎ উদ্দেশ্যে !
— মারা গেছে ? তুমি নিশ্চিত ?



— স্বচক্ষে দেখেছি। বুলেটটা লেগেছিল বুকে ! ইন্টারনাল হেমারেজ হচ্ছে ! মুখ দিয়ে গল্‌গল্‌ করে...
পঁয়ক্যারে বললে, ওভাবে উল্টোপাল্টা নয়, সব-কথা গুছিয়ে বল দিকিন্‌।
অ্যাগ্‌নেস সংক্ষেপে জানালো—ঐ জাপানী ভদ্রলোকটি তার পূর্বপরিচিত। মানে বছর-দশেক আগে মিনিট-পাঁচেকের জন্য দেখেছে। চেহারাটা মনে নেই, থাকার কথাও নয়, কিন্তু সে সন্দেহাতীত প্রমাণ দিয়েছিল। টেলিফোন সে অ্যাগ্‌নেসের সুপরিচিত একজনের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেয় ...
পঁয়ক্যারে বাধা দিয়ে বলে, সেই সুপরিচিত ভদ্রলোকটির সঙ্গেও বোধ করি তোমার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। মানে ডাচ ঈস্ট-ইন্ডিজ থেকে ইয়োরোপে ফেরার পরে ? ধর বছর-দশেক ?
অ্যাগ্‌নেস একবার চোখ তুলে তাকালো। তারপর নতনেত্রে বললে, সে কথা ঠিক।
— তাহলে টেলিফোনে শুনেই কেমন করে চিনলে তাকে ? কণ্ঠস্বরে ?
— শুধু কণ্ঠস্বরে নয়, সে লোকটা ইন্দোনেশিয়ান ভাষাতেই...
— হ্যাং য়োর ইন্দোনেশিয়ান ভাষা ! কয়েক কোটি লোক সে ভাষাটা জানে !
— তুমি বারে বারে ধমক দিচ্ছ কেন আমাকে ? ও যে আমাকে বিশেষ একটা 'ডাকনামে' ডাকল...
— আই সী ! বিশেষ 'ডাকনাম' ! যা দুনিয়ায় কেউ জানে না ! যেমন : 'জিল' ! কেমন ?
অ্যাগ্‌নেস যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, কী ? কী বললে ?
— 'জিল' ! ভা-রী, একটা কানে-কানে ডাকা আদরের ডাক—যা কেউ জানে না !
অ্যাগ্‌নেস বললে, জানি না, তুমি তা কেমন করে জানলে—
— তোমার জেনে কাজ নেই। বুঝলাম ! ঐ আদরের ডাক-নামটা শুনেই তুমি মাখনের মত গলে গেলে। তারপর ?
অ্যাগ্‌নেস তার বিচিত্র অভিজ্ঞতাটা সবিস্তারে শোনায়। অভিমান-ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে : সেই জাপানী ভদ্রলোক তাকে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে গেলেন শহরের অপর প্রান্তে—বিশেষ একজনের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে। সেদিকটায় জনমানব নেই। বোধহয় যুদ্ধ চলাকালে কার্পেট-বম্বিং হয়েছিল ! তারপর একটা বড় ভাঙা বাড়ির কাছে ওরা গাড়ি থেকে নামল। কংক্রিটের বড় বড় চাংক ডিঙিয়ে, কাঁটাতারের উপড়েপড়া বেড়া টপকিয়ে ওরা সেই ভাঙা বাড়ির এক জনশূন্য অংশে এসে উপস্থিত হল। ঠিক তখনি ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েকজন গুণ্ডা ! একেবারে অতর্কিতে ! কিছুটা হাতাহাতি, মারামারি। কিন্তু অতগুলো লোকের সঙ্গে প্রৌঢ় নাকামুরা পারবেন কেন ? কোথাও কিছু নেই গুণ্ডাদলের একজন রিভলভার বার করে পর পর দুটো শট্‌ করল জাপানী ভদ্রলোকের বুকে। উল্টে পড়লেন তিনি। মুখ দিয়ে গল্‌গল্‌ করে রক্ত.. দু-হাতে মুখ ঢেকে অ্যাগ্‌নেস কেঁদে ফেলল।
পঁয়ক্যারে উঠে বসে ওর হাতটা টেনে নিয়ে বললে, বুঝেছি ! তার ঘড়ি, আংটি, মানিব্যাগ নিয়ে ওরা পালিয়ে গেল। আর নিয়ে গেল সেই 'অথরাইজড্‌ লেটার'খানা ! এই তো ?
অ্যাগ্‌নেস তার অশ্রুআর্দ্র দুটি বিহ্বল চোখ মেলে বললে, তুমি তা-ও জান ?
— জানি বইকি, জিল ! চিঠিখানায় তুমি ঐ জাপানী শয়তানটাকে লিখে দিয়েছিলে 'ফিগারো' অফিস থেকে ফাইলটা নিয়ে আসার অনুমতি ! তুমি... তুমি ছেলেমানুষ !
অ্যাগ্‌নেস ওর বুকে মাথা রেখে কাঁদতে থাকে। পঁয়ক্যারে তাগাদা দেয়, তারপর কী হল বল ?

তুমি কী করলে ?
— আমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। জ্ঞান হবার পর দেখি, একটা কারাগারে আমি বন্দী। কারাগার ঠিক নয়, নির্জন একটা ঘর। ঘরে একটা বিছানা ছিল, আমি তাতে শুয়ে। পাশেই টেবিল, তাতে কিছু আহার্য-পানীয়। ঘরটায় সংলগ্ন একটা বাথরুমও ছিল। জানলা ছিল, কিন্তু বন্ধ। দরজাটাও। একটু শারীরিক বল ফিরে আসার পর বহু ডাকাডাকি করেছি। কেউ সাড়া দেয়নি। হাতে ঘড়ি ছিল, তাই জানি, এভাবেই প্রায় ত্রিশ ঘন্টা বন্দিনী হয়ে পড়ে ছিলাম সেই নির্জন কারাগারে। তারপর রাত আটটার সময় দরজাটা খুলে গেল। ঘরে এল দুজন যুনিফর্মধারী পুলিস। তারা কোথা থেকে খবর পেয়েছিল জানি না। ওরাই পৌঁছে দিল হোটেলে।
— ওরা কোথা থেকে খবর পেল তা তুমি জানতে চাওনি ?
— চেয়েছিলাম । ওরা আমাকে ধমকে থামিয়ে দিয়ে বরং জানতে চাইল, আমি ওখানে কীভাবে এলাম। আমি কোন জবানবন্দি দিইনি, ওরা আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে বলেছে যে, আমি যেন ওদের জবানবন্দি না দিয়ে হোটেল ছেড়ে না যাই। মানে হোটেল ছাড়ার আগে যেন থানাকে জানাই।
পঁয়ক্যারে নিঃশব্দে ঘরে বার-কয়েক পায়চারি করল। তারপর বললে, নাও, মালপত্র গুছিয়ে নাও ! এখনি তুমি হোটেল ছাড়বে। আমার অ্যাপার্টমেণ্টে গিয়ে থাকবে চল।
— কিন্তু ওরা যে বারণ করে গেল। ঐ পুলিস-অফিসার দুজন।
— সে আমি বুঝব। নাও, ওঠ।
— কিন্তু ঐ নাকামুরার, আই মীন জাপানী ভদ্রলোকটি খুন হওয়ার কথা আমি যে এখনো পুলিসকে বলিনি। সেটা না জানানো আইনত অপরাধ হবে না ?
— না, হবে না। প্রথম কথা, নাকামুরা আদৌ খুন হয়নি। দ্বিতীয় কথা, পুলিস সব কিছু জানে।
বিহ্বলভাবে অ্যাগনেস বলে, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না বব্।
— এখনো পারছ না ? আশ্চর্য ! 'ফাইল'টা মর্মান্তিকভাবে প্রয়োজন কার ? সুকর্ণো বা হাত্তার নয় ! তারা এখন জাপানী ইম্পিরিয়ালিজম-এর বিরুদ্ধে মরণপণ যুঝছে ! ফলে ফাইলটা হাতাতে চাইছে একজনই—ডাচ্ ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম-এর তরফে কমিশনার ডি-ভেল্‌ডি ! জাপান যে হেরে গেছে এটা দু-তিন সপ্তাহেই নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে। তখন মিত্রপক্ষ বস্‌বে তৃতীয় বিশ্বকে বাঁটোয়ারা করতে। ডাচ গভর্নমেণ্ট চাইবে তার ইন্দোনেশিয়ান কলোনিতে নতুন করে জাঁকিয়ে বসতে। তাই তার আগেই 'ফাইল'টা ওদের চাই। দুনিয়া না জানতে পারে, ওরা এতদিন সেখানে কী জাতের শাসন চালিয়েছে। তাই ঐ জাপানীটাকে ওরাই পাঠিয়েছিল—
— কিকন্তু তাকে হত্যা করল কে ?
— কেউই হত্যা করেনি। সমস্ত ব্যাপারটা সাজানো। হাতাহাতি মারামারি যারা করেছিল—ঐ গুন্ডাদল আর নাকামুরা—ওরা সবাই পুলিসের এজেন্ট। চোখের সামনে যে গুলিতে নাকামুরাকে খুন হতে দেখেছ সেটা ব্ল্যাঙ্ক-কার্টিজ, যে রক্ত দেখেছ সেটা নাকামুরার মুখের ভিতরে পিষে যাওয়া রঙিন ক্যাপসুল। ওদের উদ্দেশ্য ছিল দুটো—প্রথম কথা, তোমাকে আটকে রাখা; যতক্ষণ না দলের লোক পারী গিয়ে ফিগারো দপ্তর থেকে ফাইলটা উদ্ধার করে আনে। যাতে ইতিমধ্যে তুমি ওদের সন্দেহ করে ট্রাঙ্ককলে তোমার সেক্‌শানাল ইন্‌চার্জকে অন্য রকম নির্দেশ না দিতে



পার। দ্বিতীয় কথা, তোমাকে জানানো, যে, ফাইলটা হাতিয়ে নিয়ে গেল গুণ্ডার দল !
— কিন্তু সেই আধখানা ভাউচার ?
— কিসের ভাউচার ?
অ্যাগ্‌নেস সব কথা খুলে বলতে দ্বিধা করল না এখন। বব্ তো সব কিছুই জানে। আর কী লুকাবে তার কাছে ? সব কিছু শুনে বব্ বললে, তোমার উচিত ছিল সেই ছেঁড়া ভাউচারখানা সব সময় নিজের কাছে রাখা। রেস্তোরাঁর একটা ছেঁড়া বিল-ভাউচার কোনক্রমেই তোমার বিরুদ্ধে জোরালো এভিডেন্স হতে পারে না। সেটা যদি সঙ্গে থাকত তাহলে মুহূর্ত মধ্যে তুমি বুঝে ফেলতে, ঐ নাকামুরার দাখিল-করা আধখানা ভাউচার জাল ! তোমার আধখানা ভাউচারের সঙ্গে সেটা কিছুতেই খাঁজে মিলত না। ডাচ-ইন্টেলিজেন্স সম্ভবত জানে, ঐ আধখানা ভাউচারই হচ্ছে চরম আইডেন্টিফিকেশন। তাই আমস্টার্ডামে ঐ ভাউচারখানা ছাপিয়ে একটা টোপ তৈরী করেছে। ওরা এ চান্স নিতে বাধ্য হয়েছে এই আশায় যে, তোমার কাছে এখন এখানে বাকি আধখানা ভাউচার নেই।
অ্যাগ্‌নেস মাথা নেড়ে বললে, আমার এখনো কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।
— জানি,হবে না। এস, আমি প্রমাণ দিচ্ছি—
এগিয়ে এসে সে নাকামুরার ফেলে যাওয়া অ্যাটাচি-কেসটা খুলে বার করে আনল একটা ব্র্যাসিয়ার। বললে, এই ট্যাগ্‌টা দেখ। এটা আমস্টার্ডামের একটি ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর থেকে কেনা। ব্যাটাভিয়ায় এ জিনিস কেমন করে পেল তোমার সেই বন্ধু ?
অ্যাগ্‌নেস বলে, ব্যাটাভিয়াতেও এ জিনিস কিনতে পাওয়া যায়।
— আর এই ক্রাইম-থ্রিলার বইখানা ?
— কী ওখানা ?
—লক্ষ্য করে দেখ, বইটার প্রথম প্রকাশ 1940 তুমি ব্যাটাভিয়া ছেড়ে আসার দু-বছর পরে। স্বীকার করতে বাধ্য হল অ্যাগ্‌নেস, হ্যাঁ, এত খুঁটিয়ে আমি পরীক্ষা করে দেখিনি বটে।
— ন্যাচারালি । যেহেতু তুমি প্রাক্তন-গোয়েন্দা নও !
অ্যাগ্‌নেস অধোবদনে বসেই রইল !
বব্ বলে, কী হল, ওঠ ! কী অত ভাবছ ?
— ভাবছি, এরপর যখন সেই সত্যিকারের লোকটা এসে ফাইলটা চাইবে, আমি তাকে কী বলব ? কী কৈফিয়ৎ দেব ?
— কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, বরং তার হাতে ফেরত দেবে তোমার গচ্ছিত ধন ! ভয় নেই, সেটা খোয়া যায়নি ।
উৎসাহে দাঁড়িয়ে ওঠে অ্যাগ্‌নেস : যায়নি ? যায়নি ! তুমি নিশ্চিত জানো ?
— জানি ! এবার শোন, ঐ দুজন পুলিস কেন তোমাকে উদ্ধার করল।
পঁয়ক্যারের কাছে সকালের ফ্লাইটে এসে পৌঁছায় ফিগারো অফিসের একজন স্পেশাল-ক্যুরিয়ার। নির্দেশমতো সীলবন্ধ খামটা খুলে পঁয়ক্যারে দেখে চিঠিখানা ফিগারো-সম্পাদক ডক্টর লে লোরেন লিখেছেন আমস্টার্ডাম পুলিস কমিশনারকে ব্যক্তিগতভাবে:

"প্রিয় কমিশনার-সাহেব,

আপনার মৌখিক প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আমার একজন রিপোর্টারকে আমস্টার্ডামে

পাঠিয়েছিলাম মীগেরেঁর কেসটা কভার করতে। পত্রবাহক বব্ পঁয়ক্যারে আমাকে জানাচ্ছে যে, মেয়েটি কোনও নাইট-ক্লাবে গিয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আজকালকার এইসব ছোঁড়াছুঁড়ি রিপোর্টারদের বিশ্বাস করা চলে না, কোনও দায়িত্বজ্ঞান নেই! কাগজের পাতা ভরাবো কীভাবে এটাই এখন মুখ্য চিন্তা!

অবশ্য ঘটনাচক্রে একটি ফাইল আমার হাতে এসেছে। ডাচ্ ইম্পিরিয়ালিজম্ সংক্রান্ত। জাপানীরা তো আর এক পক্ষকালের মধ্যেই নতজানু হবে। খুব সম্ভবত ইন্দোনেশিয়ায় পুনরায় ডাচ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। না হবে কেন? আপনারা কয়েক শতাব্দী ধরে দেশটাকে 'সুশাসনে' রেখেছেন! ফাইলের প্রতিটি পৃষ্ঠায় তার 'জ্বলন্ত' প্রমাণ!

''অ্যাগ্নেস শ্যাম্পেনকে যদি নিতান্তই খুঁজে না পাওয়া যায়, অর্থাৎ তার নিয়মিত 'ডেস্‌প্যাচ' যদি না পাই, তাহলে ঐ ফাইলের ফটোস্ট্যাট-কপি সমেত আমার স্বলিখিত একটি ধারাবাহিক রাজনৈতিক প্রবন্ধই ছাপাতে বাধ্য হব : 'ইন্দোনেশিয়ায় প্রাক্‌যুদ্ধ ডাচ-কলোনিয়াল শাসনের ইতিকথা।' উপায় কী? সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা তো আর খালি রাখা যাবে না, কে কোথায় মদ খেয়ে পড়ে আছে বলে!

''আপনি আমার কাগজের একজন গুণগ্রাহী। অনুগ্রহ করে আমাকে একটা পরামর্শ দেবেন? আগামী সপ্তাহ থেকে ধারাবাহিক-ভাবে কোনটা ছাপানো যুক্তিযুক্ত হবে?

ভাঁ মীগেরেঁর 'অরিজিনাল ভেরমেয়ার' সংক্রান্ত আর্ট-প্রবন্ধ, না কি জ্যাক মীগেরেঁর 'অরিজিনাল গবেষণার' উপর রাজনৈতিক প্রবন্ধ ?

প্রতীক্ষারত একান্ত গুণমুগ্ধ আপনার : লে লোরেন।''

অ্যাগ্নেস চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে। বলে, তার মানে, স্যার ওটা আগে-ভাগে সরিয়ে রেখেছেন?

— ন্যাচারালি! তুমি আমস্টার্ডাম রওনা হওয়ামাত্র। সেটা এখন তাঁর ব্যক্তিগত লকারে সুরক্ষিত। তোমার নিজের টেব্‌ল্-লকার শূন্যগর্ভ! ফাইলটা সেক্‌শানাল ইনচার্জের নাগালের বাইরে! ফলে. ওদেরও!

অ্যাগ্নেস ঝাঁপিয়ে পড়ল বব্-এর উপর। বব্ টাল সামলাতে পারল না। কোথাও কিছু নেই চুমায়-চুমায় উত্তেজিত মেয়েটা ভরিয়ে দিল ববের মুখখানা!

## ।। আট ।।

264 নং প্রিন্‌সেন্‌গ্রচ্। অর্থাৎ পঁয়ক্যারের অ্যাপার্টমেন্ট। দিন-তিনেক পরের কথা। অ্যাগ্নেস এখন এখানেই আছে। পঁয়ক্যারেকে কিচেনেতে শুতে হয়নি। মেঝেতেই ম্যাট্রেস্ পেতে শোয়। প্রথম রাত্রে ওর ল্যান্ডলেডি তো ক্ষেপে আগুন। পঁয়ক্যারে যখন মধ্যরাত্রে সবান্ধবী ফিরে এল। ল্যান্ডলেডি বৃদ্ধা, নিতান্ত গাঁয়ের মানুষ। লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি। দরজা খুলে ওদের দুজনকে দেখতে পেয়েই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল, তোমাকে আমি প্রথম দিনই তো বলে রেখেছিলাম পঁয়ক্যারে—এ সব বেলেল্লাপনা এখানে চলবে না!

পঁয়ক্যারে হাত দুটি কচ্‌লে বলেছিল, মাদাম তা-বুর্গ, আজ তিন বছর তোমার বাড়িতে আছি।



কোনদিন কোন বেচাল দেখেছ? এ মেয়েটি ফ্রেঞ্চ—আমস্টার্ডামে এসে ভীষণ বিপদে পড়েছে। ওর পিছনে গুণ্ডা লেগেছে। আমার অফিসের সহকর্মী—বিশ্বাস না হয় ওর প্রেস-আইডেন্টিফিকেশন কার্ডটা পরীক্ষা করে দেখ! ওর এই দারুণ বিপদ দেখে আমি ওকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি! আমি জানি, তোমার দয়া হবেই! ও আমার ঘরে শোবে, আমি শোব কিচেনেতে। কেমন ?

বুড়ি অ্যাগ্নেসের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। অ্যাগ্নেস্ শুধু বললে : প্লীজ!

বুড়ির বিশ্বাস হল। বললে, তা হবে না। মেয়েটা আমার ঘরে শোবে। কাল সকালে হোটেল-মোটেল খুঁজে নিও। আমার ডেরায় ওসব চলবে না!

প্রথম রাত্রি সেভাবেই কেটেছিল। পরদিন বুড়ি প্রশ্ন করে জেনে নিল— অ্যাগ্নেস রোমান ক্যাথলিক নয়। প্রোটেস্টান্ট। সহজ সমাধান দাখিল করেছিল : শোন ভালমানুষের মেয়ে! মাস-খানেক থাকবে বলছ, তুমি নিজেও কষ্ট পাচ্ছ। আমাকেও ঝামেলায় ফেলেছ, আর ঐ বব্‌টাকেও ফেলেছ আতান্তরিতে। হোটেলে গিয়ে উঠলে যদি গুণ্ডার ভয় তাহলে সামনের ঐ প্রোটেস্টান্ট চার্চে চলে যাও — বে-করে ফিরে এস। তোমার কর্তা তো ফৌত হয়েছে, অসুবিধা কিছুই নেই। পারীতে যাবার সময় না হয় ডিভোর্স নিয়ে নিও! কেমন? অবশ্য বব্ খুব ভাল ছেলে, রোজগারও ভাল। তোমরা দুটিতে মিলে-মিশেও চিরটাকাল থাকতে পারবে মনে লাগে। তবে তোমরা তো আমাদের মত রোমান ক্যাথলিক নও! দেখ যা ভাল বোঝ কর!

শুনে বব্ বলেছিল, বুড়ি বুদ্ধিটা মন্দ দেয়নি। না হয়, পারী ফিরে যাবার আগে ডিভোর্স নিয়ে নিও! তুমি কী বল?

— আমি রাজী। তবে যে-কোন চার্চ হলে চলবে না। বিশেষ একটি চার্চে আমাদের বিয়েটা হবে। সেই শর্তে যদি তুমি রাজী থাক তবেই সম্মতি দেব!

— বিশেষ একটি চার্চ? সেটা কোথায়?

— রটার্ডামে। সেন্ট লরেন্স চার্চ!

— হঠাৎ ঐ গীজটা কেন?

— ওখানে আমার বাবা আর মায়ের বিবাহ হয়েছিল।

পঁয়ক্যারে অবাক হয়ে যায়। বলে, এটা তো জানা ছিল না। আমার ধারণা ...

— সে ধারণাটা ভুল। আমি 'বাস্টার্ড' নই! একদিন সব কথা খুলে বল্‌ব তোমাকে।

সে সুযোগ আর হয়নি। সময় কোথা? প্রতিদিন সকালে চলে যায় কাইজারগচ। না, ভাঁ মীগেরেঁ নিজের বাড়িতে নেই। পাশেই একখানা স্টুডিও ভাড়া করা হয়েছে—যেখানে বসে মীগেরেঁ পুলিস-প্রহরায় ছবিখানা আঁকছে। উপায় কী? মহমান্য আদালত মীগেরেঁকে জামিন দেননি, ফলে নিজের ডেরায় সে ফিরতে পারে না। এদিকে জেলখানায় বসে ছবি আঁকতে মীগেরেঁ গররাজী। তাই এই বিকল্প ব্যবস্থা। ওর প্রাসাদোপম বাড়ির পাশেই একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেওয়া হয়েছে। তাকে বলতে পার বিকল্প কারাগার, অথবা বিকল্প স্টুডিও। বৃদ্ধ সেখানেই বসে বিরাট একখানা 'অরিজিনাল ভেরমেয়ার' আঁকছেন।

এমনিতে বুড়ো বদমেজাজী; খিটখিটে ; কিন্তু অ্যাগ্নেসের প্রতি প্রথম দিন থেকেই কী জানি কেন উনি সদয়। বলেছিলেন, আমাকে নিয়ে পণ্ডশ্রম করছ মা, আমার উপর লেখা বই বাজারে কাটবে না, পোকায় কাটবে।

অ্যাগ্নেস বলেছিল, কেন? আমস্টার্ডামে আজ কোন্ জীবিত শিল্পী আছেন যাঁর ছবি লুভ্ বা রাইখ্স্ মুজিয়ামে আছে?

বৃদ্ধ হেসে বলেছিলেন, কিন্তু সে সব ছবিতে তো আমার স্বাক্ষর নেই?

— ছবির মূল্য কি চিত্রকরের স্বাক্ষরে?

মীগেরেঁ বলেছিলেন, ঠিক আছে। কী চাও তুমি, বল?

— আপনার সব কথা, স-ব কথা আমাকে অকপটে জানাতে হবে। কিছুই রেখে ঢেকে বলতে পারবেন না। আমি প্রতিদিন এসে শুনব। টেপ-রেকর্ড করে যাব। রাজী?

— রাজী। কিন্তু তাহলে আমাকে কী মজুরী দেবে?

— মজুরী! কী চান বলুন?

— আমাকে সিটিং দিতে হবে। আমি তোর একখানা পোর্ট্রেট আঁকব!

— আমার? কেন? আমার চেহারায় আপনি কী দেখলেন?

— তোর মধ্যে আমি...না,ঐ একটা কথা আমি বল্ব না। বলতে পারব না। ধরে নে তোর মুখে আমি একটি প্রিয়জনের মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছি। যে মেয়েটা আমার জীবন থেকে বহুদিন আগে হারিয়ে গেছে...

— আপনি কি মাদাম অ্যানা মীগেরেঁর কথা বলছেন, মসুয়েঁ?

— কেমন করে আন্দাজ করলি তুই?

— বেশ, আপনি মুক্ত হলে আমি সিটিং দেব, আপনি আমার পোর্ট্রেট আঁকবেন। তাহলে সব কথা খুলে বলবেন তো?

— বল্ব। তুই প্রতিদিন আসবি তো?

— আসব।

প্রতিদিনই সে যায়। বৃদ্ধ ছবি আঁকতে আঁকতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখন বলেন, আয়, তোর যন্ত্রটা নিয়ে বস। আমি বলতে শুরু করি। কাল কতদূর যেন বলেছিলাম?

জো লক্ষ্য করেছিল শিল্পীর ভাবান্তরটুকু।

সেই 1937 সালে, অর্থাৎ রোমের চিত্রশালা থেকে কারাভাগগোর ছবিখানা দেখবার পর থেকেই। কেন, কী বৃত্তান্ত তা আন্দাজ করতে পারেনি—তবে ওর আর্টিস্ট স্বামী যে নিতান্ত 'মুডী' এটুকু জোহানার ভাল রকম জানা।

ঘটনাটা ঘটল যখন মধুচন্দ্রিমার পরিক্রমা-পথে ওরা এসে উপনীত হল রোকেব্রুন-এ। রোকেব্রুন দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রতীরবর্তী একটা গণ্ডগ্রাম। মেন্টন আর মোনাকোর মাঝামাঝি। ইতালীর সীমান্ত থেকে মাইল-দশেক ফ্রান্সের ভিতর। সমুদ্রবেলায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি ছবির মতো একখানি গ্রাম। একটি মাত্র বাক্যে মীগেরেঁ গ্রামটার স্বরূপ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অ্যাগ্নেসকে : বুঝলি, যেন কন্স্টেব্ল্-এর আঁকা একখানা দিল্তোড় ক্যানভাস্!

এখানে পৌঁছে ঘটনাচক্রে গাড়িটা গেল বিগড়ে। সেই যে থার্ডহ্যান্ড গাড়িখানায় চড়ে মীগেরেঁ সদ্যপরিণীতাকে নিয়ে বার হয়েছে দক্ষিণ ইয়োরোপ ভ্রমণে। বাধ্য হয়ে এক মটোর-মেকানিকের শরণাপন্ন হতে হল। সে গাড়িটা পরীক্ষা করে জানালো দিন-দুই লাগবে গাড়িটা মেরামত করতে। অগত্যা রাত্রিবাস করতে হল স্থানীয় একটি সরাইখানায় : লা ম্যাগ্নিফিক!



পরদিন গ্রামটা ঘুরে দেখতে গিয়ে টিলার-মাথায় একটা দ্বিতলবাড়ির প্রেমে পড়ে গেল মীগেরেঁ। বাড়িটার নাম: 'প্রিমাভেরা' বা 'বসন্ত'। হান কেন আকৃষ্ট হল? বাড়িটার নির্জনতায়? অথবা নামে? বত্তিচেল্লির জীবনের মোড়-ফেরানো বিশ্ববন্দিত ছবিখানার কথা কি তার মনে পড়ে গিয়েছিল? সেটা আজ তার মনে নেই। খোঁজ নিয়ে জানতে পারল— স্থানীয় লোকের বিশ্বাস ওটা ভূতের-বাড়ি। কয়েক বছর আগে সেখানে নাকি জোড়া খুন হয়। তারপর থেকে বাড়িটা আর ভাড়া হয়নি। হান মালিকের সঙ্গে দেখা করল। হপ্তায় মাত্র আঠারো শিলিং ভাড়ায় ঐ প্রকাণ্ড প্রাসাদটা ভাড়া নিল। জো তো অবাক।

বলে, কী হবে ঐ বাড়িটা ভাড়া নিয়ে?

— আমার মাথায় গ্র্যান্ড একটা আইডিয়া এসেছে। এখানে বসে আমি একখানা প্রকাণ্ড ছবি আঁকব। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্যানভাস্! আমি এখানেই থাকব মাস-কয়েক। তুমি কী করবে? হল্যান্ডে ফিরে যাবে?

জো বুঝতে পেরেছে পাগলটাকে টলানো যাবে না। তাই বলে, না আমি পারীতে থাকব। আমার এক বান্ধবীর অ্যাপার্টমেন্টে। সে ক্যাবারে-গার্ল। একাই থাকে। তাহলে সপ্তাহান্তে তুমি পারীতে গিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে, অথবা আমিই চলে আসব এখানে—

— না! তুমি আসবে না। কিছুতেই না! আমি সম্পূর্ণ নির্জন-সাধনা করতে চাই। বরং আমিই মাঝে মাঝে পারী যাব। তুমি হঠাৎ যেন এসে আমার তপস্যাভঙ্গ কর না।

জো প্রতিবাদ করল না। মেনে নিল। ওরা দুজনে প্রথমে ফিরে গেল হল্যান্ডে। মালপত্র বাঁধাছাদা করে চলে এল দক্ষিণ ফ্রান্সে। হান এসে উঠল 'প্রিমাভেরা'য়; জো পারীতে।

হান কায়মনোবাক্যে নিমগ্ন হল তার সাধনায়—তান্ত্রিক পদ্ধতিতে!

দুনিয়ার উপর প্রতিশোধ নেওয়াটা যে বাকি!

সবার আগে বধ করতে হবে জীবনের পয়লা-নম্বর শত্রু : ডক্টর অ্যাব্রাহাম ব্রেডিউস্-কে! তিনি তখন তদানীন্তন হল্যান্ডে সবচেয়ে বিখ্যাত আর্ট-হিস্টোরিয়ান তথা চিত্রশিল্প বিশারদ! তাঁর বিশেষ ক্ষেত্র : ভেরমেয়ার।

জীবনে দ-দুবার হান আঘাত পেয়েছে ঐ বুড়োটার কাছ থেকে। প্রত্যাঘাত করার সুযোগ সে পায়নি! পাওয়ার কথাও নয়। কোথায় প্রতিষ্ঠাকামী নগণ্য শিল্পযশপ্রার্থী ভাঁ মীগেরেঁ আর কোথায় সমগ্র নেদারল্যান্ডস্-এর শ্রেষ্ঠ আর্ট-কনৌশার ডক্টর অ্যাব্রাহাম ব্রেডিউস্! দীর্ঘ ষোলো বছর ধরে প্রতিহিংসার আগুন মীগেরেঁর বুকে ধিকিধিকি জ্বলছে। এতদিনে এসেছে প্রত্যাঘাতের চরম সুযোগ!

প্রথমবার আঘাতটা পেয়েছিল ওর একক প্রদর্শনীতে। ঘড়ি-আংটি বন্ধক দিয়ে সাতাশ বছরের উদীয়মান শিল্পীর সেদিন কত আশা, কত আকাঙ্খা! উদ্দীপনা যত না তার নিজের, তার চেয়েও বেশি তার সুন্দরী স্ত্রী অ্যানার। 'হল'-ভাড়া মিটিয়েছে, নিমন্ত্রণপত্র ছেপেছে, পায়ে-হেঁটে বড় বড় শিল্পী, শিল্প-বোদ্ধা, সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে। অথচ উদ্বোধনের দিনে বিশেষ কেউই আসেননি। প্রদর্শনীর শেষ দিনে মরিয়া হয়ে সে দেখা করেছিল ডক্টর ব্রেডিউস্-এর সঙ্গে। প্রায় হাতে-পায়ে ধরে তাকে রাজী করায়। শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত ব্যয় করে গাড়ি করে তাঁকে নিয়ে আসে প্রদর্শনীতে। অথচ সর্বসমক্ষেই তিনি অট্টহাস্য করে বললেন, এই ছবি দেখাতে তুমি আমাকে ধরে এনেছ হে? শোন বাপু, খোলা কথা বলি—তোমার দ্বারা ছবি আঁকা কোনদিন

হবে না। অন্য কোনও প্রফেশানে নেমে পড় বরং; এখনো সময় আছে!
চরম অপমানিত বোধ করেছিল সেদিন!
দ্বিতীয় আঘাতও পেয়েছে ঐ ব্রেডিউস্-এর কাছেই। ঐ ঘটনার একযুগ পরে, 1928-এ।
হানের বন্ধু ভাঁ উইজগাঁটেন কোন্ অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করে আনল একখানা প্রাচীন তৈলচিত্র: 'ক্যাভেলিয়র' (অভিজাত অশ্বারোহী)। দুই বন্ধুরই মনে হল সেখানি প্রখ্যাত ওলন্দাজ শিল্পী ফ্রান্স হাল্জ্-এর (1580-1666) অরিজিনাল। তা যদি সত্য হয় তাহলে সেটা একটা ছপ্পড়-ফোঁড় সৌভাগ্য! মীগেরেঁ এতদিন 'রেস্টোরেশন'-বিদ্যায় (প্রাচীন-চিত্রের মেরামতির কাজে) বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে। দুই বন্ধু মিলে ক্যানভাস্খানা প্রথমে সাফা করল। তেলরঙের ছবিখানা এখানে-ওখানে ফেটে-ফুটে গিয়েছিল। নিপুণ দক্ষতায় সেগুলি মেরামত করা হল। ফ্রেমের কাঠখানাও ফেটে গেছে—দর্শনধারী নয় তা। অগত্যা নতুন ফ্রেমে ছবিটা সাঁটল, যাতে নিলামে সেটা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সব শেষে ক্যানভাসের উপর মীগেরেঁ খুব আলতোভাবে একটা অনচ্ছ ভার্নিশের প্রলেপ দিল। তারপর ছবিখানা বগলদাবা করে আর বুকে অনেক আশা নিয়ে দুই বন্ধু উপস্থিত হল ডক্টর ডি.গ্রুট্-এর কাছে।
ডক্টর গ্রুট আমস্টার্ডামের একজন প্রখ্যাত শিল্প-সমজদার তথা হিস্টোরিয়ান। তিনি পরীক্ষা করে রায় দিলেন:
— হ্যাঁ, এই অনবদ্য চিত্রটি অরিজিনাল হাল্জ্-ই বটে! তিনি শুধু সার্টিফিকেট লিখে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে সেটিকে নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করলেন। আশাতিরিক্ত দর উঠল-প্রায় আড়াই লক্ষ গিল্ডার্স! তার মানে ছবিটি বিক্রয় হলেই ওরা দুই বন্ধু এই ধাষ্টামোর ব্যবসায় ছাড়বে—ঐ মৃতব্যক্তির ফটো দেখে পোর্ট্রেট আঁকা আর রেস্টোরেশনের ক্লান্তিকর কাজ। এবার দুজনেই মনের সুখে ছবি আঁকবে ইচ্ছা মতো। কিন্তু ক্রেতা একটি শর্ত করলেন—তিনি ডক্টর ব্রেডিউসকে দিয়ে ছবিটি একবার যাচাই করিয়ে নিতে চান। ডক্টর ব্রেডিউস যদি বলেন, 'এটা জাল', তাহলে দামটা ফেরত দিতে হবে, ছবিখানি তাহলে তিনি কিনবেন না।
ডক্টর গ্রুট বললেন, ভয় নেই, আমি নিঃসন্দেহ—ডক্টর ব্রেডিউস আমার মতের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না। প্রফেশনাল এথিক্সের জন্য নয়, এখানা সত্যই অরিজিনাল হাল্জ্!
ব্রেডিউস তখন সত্তরের কোঠায়। নেদারল্যান্ডস্-এর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ শিল্প-সমজদার। ওরা তিনজনে তাঁর দ্বারস্থ হল—দুই বিক্রেতা আর একজন ক্রেতা। ব্রেডিউস মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিলেন ওদের সাতমহলা প্রাসাদ। ফতোয়া জারী করলেন: এটা নকল!
হেতু? ওঁর যুক্তি—ছবিতে কিছু রঙ আছে যা যথেষ্ট পুরাতন নয়! মীগরেঁ আর তার বন্ধু বারে বারে বোঝানোর চেষ্টা করল—এইটুকু নতুন রঙ তারাই লাগিয়েছে মেরামতির সময়। বৃদ্ধ সেকথা মানতে রাজী নন। বলেন, তাছাড়া ফ্রেমটা দেখ! কাঠগুলো সদ্য চেরাই-করা। পেরেকগুলোয় মরচে লাগেনি।
মীগেরেঁ আর্তনাদ করে উঠেছিল, কী আশ্চর্য! ফ্রেমটা তো মাসখানেক আগে আমিই বানিয়েছি স্যার!
বৃদ্ধ বিজ্ঞের হাসি হেসে বলেছিলেন, বাপু হে! অত সহজে ধোঁকাবাজি দেওয়া যায়না, বুঝেছ? নতুন করে না বাঁধিয়ে পুরানো কাঠ, মরচে-ধরা পেরেকেও তোমরা ব্যবহার করতে পারতে। সাধারণ মানুষ তাতে ধোঁকা খেত! সেটা বড় কথা নয়—আসল কথা: শিল্পশৈলী! গ্রান্ড



মাস্টার্সদের তুলির টান দেখলেই বোঝা যায়। অবশ্য দেখবার চোখ চাই! অভিজ্ঞতা চাই! ইন্টুইশান চাই! ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাও চাই। বুঝলে? আমি আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ নিয়ে বলতে পারি: মহান শিল্পী ফ্রান্স হাল্জ্-এর তুলি এ ক্যানভাসকে কোনদিন চুমু খায়নি!
টাকাটা ফেরত দিতে হল। জলের দরে ছবিখানা পরে বিক্রি হয়ে যায়। অথচ সেটা সত্যই ছিল ফ্রান্স হাল্জ্-এর অরিজিনাল!

রোম চিত্রশালায় কারাভাগগোর ছবিখানা দেখ্তে দেখ্তে এইসব কথাই মনে পড়ে গিয়েছিল হান মীগেরেঁর। চকিতে ওর স্মরণ হয়েছিল আর একটি চিত্র-ইতিহাস প্রসঙ্গ: '
ভেরমেয়ারের সুবিখ্যাত ক্যানভাস: ''মার্থা ও মেরীর আবাসে যীশু।'' সেটি হংস মধ্যে একমাত্র মরাল! অর্থাৎ বাইবেল-অবলম্বনে ভেরমেয়ার ঐ একখানা মাত্র ছবি এঁকেছেন। তাঁর অধিকাংশ চিত্রের বিষয়বস্তু সমকালীন ডাচ্ সমাজ-জীবন থেকে চয়িত। ঐ একটিমাত্র ধর্মীয় চিত্র। আর সেই অনবদ্য ক্যানভাসটির আবিষ্কর্তা স্বয়ং ডক্টর ব্রেডিউস!
লন্ডনে একজন ফুটপাথ-ফেরিওয়ালার কাছ থেকে তিনি জলের দরে সেখানা কেনেন। বেচারি ফেরিওয়ালা! সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি—ওখানা 'অরিজিনাল ভেরমেয়ার'! কয়েক শিলিং-এ কিনে ব্রেডিউস সেটি কয়েক লক্ষ গিল্ডার্সে বিক্রি করেন! একটি আর্ট-জার্নালে তিনি প্রসঙ্গত যা লিখেছিলেন তার আক্ষরিক অনুবাদ—''ভেরমিয়ারের ধর্মীয় বিষয়ে আঁকা কোন ছবি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তার মানে এ নয় যে, বাইবেল-অবলম্বনে মহান শিল্পী ভেরমেয়ার কোনও ছবি আঁকেননি। আলোচ্য ছবিখানিই তো একটি জাজ্জ্বল্য প্রমাণ! আমার অনুমান—এই চিত্রের পিছনে কারাভাগ্গোর প্রভাব আছে। ভেরমেয়ার ইতালী ভ্রমণ করেছিলেন এ-কথা অনুমান করা চলে। রোম-ভেনিস-ফ্লোরেন্স-মিলান ছিল তাঁর আমলে শিল্পীতীর্থ। মুসলমানের কাছে মক্কা, রোমান-ক্যাথলিকের কাছে ভ্যাটিকান সিটি! আমার ধারণা কারাভাগ্গোর কোন একখানা (সুধীজন মাত্রেই জানেন, একই বিষয়ে কারাভাগ্গো তিন-তিনখানি ছবি আঁকেন) 'ইম্মেয়ূস্ পান্থশালায় যীশু' তিনি দর্শন করেন ইতালীর শিল্পতীর্থ পরিক্রমাকালে। হল্যান্ডে ফিরে এসে তিনি এঁকেছিলেন এই ছবিখানা: ''মেরী ও মার্থার আবাসে যীশু।'' আমার দৃঢ় বিশ্বাস: বাইবেল-অবলম্বনে-আঁকা ভেরমেয়ারের আরও দু-একটি তৈলচিত্র ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হবে! এ বৃদ্ধ হয়তো তখন থাকবে না, কিন্তু তার ভবিষ্যদ্বাণীটুকু তখনো থাকবে।''
ইতালীর শিল্পতীর্থ পরিক্রমাকালে কারাভাগ্গোর ঐ ছবিখানা দেখতে দেখতে এই কথাটাই মনে পড়ে গিয়েছিল মীগেরেঁর। ওর মনে পড়ে গিয়েছিল—ডক্টর ব্রেডিউস জীবিত, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী এখনো ফলেনি! মনশ্চক্ষে ও দেখ্তে পেল একটি নবাবিষ্কৃত অরিজিনাল ভেরমেয়ার—যীশুর জীবন থেকে বেছে নেওয়া! যে ছবি পয়দা হবে মীগেরেঁর তুলির টানে। ছবি তো নয়—একটা কেঁচো! ও মনশ্চক্ষে এটাও দেখতে পেল যে, বৃদ্ধ ব্রেডিউস হাঁ-করে কেঁচোটা গিলতে আসছেন! ঠিক মতো সুতো ছেড়ে খেলিয়ে তুলতে পারলেই রাঘব-বোয়াল কাৎ! ডাঙায় উঠে খাবি খাবে বুড়োটা!
ছয় মাসের নির্জন সাধনায় মীগেরেঁ যে 'অরিজিনাল' ভেরমেয়ারটি পয়দা করলো তার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করতে হলে 'আর্ট' আর 'ক্রাফ্ট'কে সমান মর্যাদা দিতে হবে। শিল্পকলাকে সময়-বিশেষে ছাপিয়ে উঠেছে রসায়ন। প্রথমে 'আর্ট'-প্রসঙ্গটা আলোচনা করি:

বিষয়বস্তুটা: ইম্মায়ুস্-এ যীশু! ছবির মাপ, সাড়ে পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি বাই সওয়া পঞ্চাশ ইঞ্চি!
কম্পোজিশান : বলা যায় কারাভাগ্গো অনুসরণে। কারভাগ্গোর চিত্রে ছিল পাঁচটি চরিত্র, এখানে একটি কমিয়ে করা হল চারটি। পরিচারিকাটিকে যীশুর আরও কাছে আনা হয়েছে, যেহেতু চরিত্রটি এখানে অপসারিত। দুই, সহ-ভোজীর চিত্র রূপায়ণে কারাভাগ্গো যে নাটকীয়তা দেখিয়েছেন— বামপ্রান্তবাসীর বামহস্তের ব্যঞ্জনায় এবং দক্ষিণপ্রান্তের সহভোজীর দুইহাতে টেবিলের কাঠখানা চেপে ধরায়—সেই নাটকীয়তা কিন্তু নেই মীগেরেঁর কম্পোজিশানে। কারাভাগ্গো-যিশুর দক্ষিণ তর্জনা বাঙ্ময়, তিনি তরুণতর ও সজীব; অপরপক্ষে মীগেরেঁর যীশু যেন সদ্য কফিন থেকে উঠে এসেছেন! তাঁর করুণাঘন নতনয়ন সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা মৃত্যুছায়া তাঁকে ঘিরে আছে! দুটি ক্ষেত্রেই পানীয় আধারটির একই অবস্থান। বৈপরীত্যের ব্যঞ্জনা এটুকুই—কারভাগ্গো 'টিপিক্যাল পিরামিডাল কম্পোজিশান' বেছে নিয়ে রমণী মূর্তিকে রেখেছেন ত্রিকোণভূমির বাহিরে, আর মীগেরেঁর কম্পোজিশন তরঙ্গভঙ্গের কেরামতিতে। রঙ দিয়ে তিনি ভারসাম্য রক্ষা করেছেন!
কেন এই নাটকীয়তার অভাব? যেহেতু চিত্রশৈলী ভেরমেয়ার অনুসরণে! যেহেতু ওটিকে ভেরমেয়ারের আঁকা বলে চালাতে হবে। তাহলে জেনে নিতে হয়—কী ছিল ভেরমেয়ারের শৈলীবৈশিষ্ট্য?
ভেরমেয়ারের ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—নাটকীয়তার অভাব। ঘরোয়া পরিবেশের। তাঁর দৃশ্যপট প্রায় সর্বদাই চার-দেওয়ালের ভিতর—গার্হস্থ্যচিত্র। যাকে বলে: 'জেন্‌রি পিকচার'! সীবনরতা, সঙ্গীতমগ্না, লিপিরচয়িতা, তাসের আড্ডা বা জগে দুধ ঢালা হচ্ছে!
ওঁর চিত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : বাস্তবতা! শিল্পীর দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ —কিছুই তাঁর নজর এড়ায় না।
একটা উদাহরণ দিই: তাঁর অতিবিখ্যাত ছোট্ট ছবি Maidservant Pouring Milk (পরিচারিকা পাত্রে দুধ ঢালছে) ছবিটি লক্ষ্য করে দেখুন— দেখবেন, পিছনের দেওয়ালে অহেতুক একটা পেরেক পোঁতা আছে। পেরেকের মাথাটা দেওয়াল থেকে আধ-ইঞ্চি পরিমাণ বেরিয়ে আছে। তার ফলে দেওয়ালে এক-চিলতে একটু ছায়াও পড়েছে! শুধু তাই নয়—আরও লক্ষ্য করলে দেখবেন —যে লোকটা অতীত কালে দেওয়ালে ঐ পেরেকটা পুঁতেছিল সে পাথরের দেওয়ালে আরও কয়েকস্থানে পেরেকটা পুঁতবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। সেই অকথিত ঘটনার চিহ্ন রয়ে গেছে দেওয়ালে। ভেরমেয়ারের দৃষ্টিতে সেটুকুও এড়িয়ে যায়নি, তিনি সযত্নে সেই পেরেক-পোঁতার ব্যর্থ প্রচেষ্টার সাক্ষীগুলি এঁকে গেছেন! বস্তুত ইয়োরোপে অরিজিনালটি দেখার আগে তা আমার নজরে পড়েনি!
ভেরমেয়ারের-চিত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—আলো আসবে বাঁ দিক থেকে। সেদিকে থাকবে একটা বাতায়ন-আভাস। শিল্পীর দৃষ্টিকোণ সচরাচর সান-বাঁধানো মেঝে থেকে ফুট-চারেক উঁচুতে। লক্ষণীয়, ভেরমেয়ারের ঐসব বৈশিষ্ট্য ধরা দিয়েছে মীগেরেঁর নকল ছবিতে। অবশ্য ভেরমেয়ারের-শৈলীর যেটি তুরুপের টেক্কা সেটার বিষয়ে আলোচনা করা বৃথা। কারণ সেটি অনুভব করতে হলে আপনাকে অরিজিনাল ভেরমেয়ার দেখতে হবে—রঙিন ফটোগ্রাফে নয়! সেটা হল : তুলির উপর তাঁর অদ্বিতীয় দক্ষতা! খুব হাল্কা টানে তিনি যে 'টোনাল এফেক্ট' ফুটিয়ে তুলতে পারতেন, তা অননুকরণীয়। সেখানে মীগেরেঁ কতটা সাফল্য লাভ করেছিল, জানি না। তার নকল ছবির অরিজিনাল তো আপনার-আমার নাগালের বাইরে। কিন্তু



আর্ট-কনৌশারদের যে সে কাৎ করেছিল-আর্ট-ইতিহাস তার সাক্ষী!
'আর্ট' ছেড়ে এবার 'ক্রাফ্‌ট্'। 'শিল্প' ছেড়ে 'প্রয়োগবিদ্যায়'।
সবার আগে পারী থেকে কিনে আনল সপ্তদশ-শতাব্দীতে আঁকা একখানা মামুলী ক্যানভাস। সস্তা দামে। অতি সযত্নে খুলে ফেল্‌ল তার ফ্রেম। কাঠগুলো সযত্নে সরিয়ে রাখল, আর মরচে ধরা প্রত্যেকটি পেরেক, তুলোয় মুড়ে।

এরপর গেল রঙ কিনতে। বাজার থেকে রঙ কিনলে হবে না—প্রবঞ্চনা হতে হবে নীরন্ধ্র, নিশ্ছিদ্র, অভেদ্য! ছবির দোকানে যেসব রঙ—কেক অথবা টিউব—কিনতে পাওয়া যায় তা চলবে না। সেগুলি সিন্থেটিক। ভেরমেয়ারের আমলে তা বাজারে পাওয়া যেত না! তাহলে সপ্তদশ-শতাব্দীর চিত্রকর রঙ পেত কোথায়? কেন? সহজ উত্তর : রাজারা যেখানে মানিক পায়। প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারে হাত পেতে। গবেষণা করে জানল, সে-আমলে প্রতিটি শিল্পী নিজের রঙ নিজে বানাতেন। তাই সই! হান মীগেরেঁও তাই বানাবে।
ভার্মিলিয়ান? যোগাড় করল 'সিনবার'— মারকিউরিক সালফাইড।

বার্ন্ট সিয়েনা চাও? কেমিস্টের কাছ থেকে কিনে আন হাইড্রেটেড ফেরিক অক্সাইড আর ম্যাঙ্গানিজ ডায়োক্সাইড। এবার ওজন-দাঁড়িতে ওজন করে মেশাও। দাঁড়াও, মেশাবার আগে দুটোই আলাদা ভাবে খল-নুড়িতে ভালো করে মিহি করে নাও। নাহলে রঙটা খোল্‌তাই হবে না। এবার আন্দাজ মতন যোগ কর দিকিন বিশুদ্ধ পলিমাটি! ব্যস্! হয়ে গেল ফার্স্ট-ক্লাস বার্ন্ট-সিয়েনা! উইন্ডসর নিউটনও লজ্জা পাবে!
গাঢ় নীল রঙ চাই? না বাপু, 'আলট্রামেরিন' চলবে না। ওটা সিন্থেটিক। ভেরমেয়ার ওটা ব্যবহার করেননি। এক কাজ কর : যোগাড় কর কিছুটা বিশুদ্ধ 'ইন্ডিগো'! 'নীল' গো! ঐ যে এশিয়াতে একটা ব্রিটিশ উপনিবেশ আছে না—ইন্ডিয়া, না কী-যেন-নাম, সেখানকার নিগারগুলো এককালে বানাতো। বাজারে খোঁজ করে দেখ, এখনো পাবে।
হলুদের জন্য চাই গাম্বোগ আর ইয়োলো অকার। নির্ভেজাল খনিজ রঙ। প্রকৃতিদত্ত।
হাল্কা নীল রঙের দরকার হলে ভালো করে গুঁড়িয়ে নিও 'লাপিস্ লাজুলি'।
আর চাই নানান কেমিক্যাল — ফর্ম্যাল্ডিহাইড, লাইলাকের তেল, তিশির তেল, ল্যাভেন্ডার—এছাড়া খল-নুড়ি, ব্যালেন্স, স্প্যাচুলা, গ্লাভস্!
আর্টিস্টের স্টুডিও তো নয়, ডিস্পেন্সিং কেমিস্টের ল্যাবরেটারি!

মাসখানেকের সাধনায় তৈরী হল একসেট রঙ—যা খোদ প্রকৃতিদত্ত—যা ব্যবহৃত হয়েছে দশ-পনের হাজার বছর আগে আল্‌তামেরিয়ার গুহায়, পরে অজন্তার প্রাচীরে, এই তো সেদিন চিম্বাবুয়ে থেকে ভেরমেয়ারের স্টুডিওতে।
পুরাতন ক্যানভাসের তেলরঙা ছবিটা মুছে ফেলাও বড় সহজ নয়। নিচেকার ক্যানভাসে আঘাত লাগবে না, আঁশ উঠে আসবে না, অথচ উপরের ছবিখানা বেমালুম উপে যাবে। গেল।
কিন্তু ঐ নব্বুই বছরের বুড়ির গালের চুল-ফাটগুলো? যেগুলো মহাকাল তাঁর তুলিতে এঁকে চলেন শতাব্দীর অধ্যবসায়ে? ছবি মুছে ফেল্‌লেও সেই চুল-ফাট দাগগুলো যে চাই! থাকল!

মীগেরেঁ ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড পিজবোর্ডের *কার্টুনে এঁকে ফেলেছে তার—মানে ভেরমেয়ারের—ছবিখানার আউটলাইন : ইম্মেয়ুস পান্থশালায় যীশু!

সরাইখানার টেবিলে প্লেটের উপর খাদ্যদ্রব্যাদি আঁকবার সময় আপনমনেই হেসে উঠ্‌ল মীগেরেঁ। নিজের মনেই বলল : বান্‌রুটি তো নয়, যেন বঁড়শির টোপ! যেন ডক্টর ব্রেডিউসকে এখান থেকেই ডাকছে : আয়! ফলার পেকেছে; খাবিনে? এবার কার্টুনটা ট্রান্সফার করল প্রাচীন ক্যানভাসে। শুরু হল তেল রঙের ছবি। ছয়মাস পরে শেষও হল একদিন।

এর ভিতর দু-দুটি দুর্ঘটনা ঘটেছে! দুবারই কান ঘেঁষে বেঁচে গেছে।

এক নম্বর : কোন খবর না দিয়েই মাঝরাতে একবার জো এসে হাজির। তার বোধহয় সন্দেহ হয়েছিল—হান কোন নতুন সুন্দরীর প্রেমে পড়েছে। এই নির্জন সাধনা একটা ভেক! ওকে তো চিনতে বাকি নেই জো-র। অ্যানার চোখের আড়ালে যে কায়দায় জো-র সঙ্গে প্রেম করেছে, এখন যে সেই কায়দায় জো-য়ের চোখের আড়ালে নতুন ডলপুতুল নিয়ে খেলতে বসেনি তারই বা নিশ্চয়তা কী? জো সেবার সারাটা বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছিল। না-কোনও 'ক্লু' পেল না। কোন কস্‌মেটিক, চুলের কাঁটা, রিবন-ডোনেট-ব্র্যাসিয়ার, প্যান্টি—কোন কিছুই আবিষ্কার করতে পারল না। এই ব্যর্থতায় সে অবশ্য খুশিই হল। রাতটা হানের বাহুবন্ধে কাটিয়ে পর দিন ফিরে গেল পারীতে। আপনারা প্রশ্ন করবেন—আর্ট-ডীলারের প্রাক্তন এবং আর্টিস্টের বর্তমান ঘরণী কি লক্ষ্য করেনি ওর স্টুডিওর ঐসব অপ্রত্যাশিত সাজ-সরঞ্জাম? খল-নুড়ি খনিজ রঙ? রঙের টিউব-এর অনুপস্থিতি? এমনকি ঘর-জোড়া অতবড় ক্যানভাসখানা? না হয় চাপা দেওয়াই আছে। জানি না। ইতিহাস নীরব। জো-এর সঙ্গে মীগেরেঁর ডিভোর্স হয় 1943-এ। না তার আগে, না তার পরে দুজনের একজনও সে বিষয়ে কিছু বলে যায়নি।

দু-নম্বরের দুর্ঘটনা আরও মারাত্মক!

ঐ সমুদ্রতীরের টুরিস্ট-স্পটে হঠাৎ একটি তরুণী নিখোঁজ হয়ে যায়।

হয়তো সমুদ্রস্নান করতে গিয়েছিল একলা-একলা। তার জলমগ্ন মৃতদেহ কিন্তু ভেসে আসেনি। এ ঘটনা ঘটে, যখন নাকি হান ছবিটা প্রায় শেষ করেছে। হানের প্রতিবেশী কোন সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি থানায় গিয়ে জানায় 'প্রিমেভেরা'র ঐ বিদেশী লোকটাকে সে সন্দেহ করে। লোকটা কারও সঙ্গে মেশে না, কথা বলে না। কী করে সে ওখানে? নোটজাল? ওর বাড়ির চিম্‌নি দিয়ে অনর্গল অত ধোঁয়াই বা বার হয় কেন? ধোঁয়া নানান রঙের, নানান গন্ধের। তাছাড়া এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে, ধোঁয়া দিবারাত্র নির্গত হয়। ব্যাপারটা কী? মাঝরাতেও কি ঐ একলা মানুষটা রান্না করে? নিঃসন্দেহে সে কিছু পুড়িয়ে ফেলছে, পূতিগন্ধময় কোন কিছু। কী সেটা?

পুলিসের সন্দেহ হল—ঐ বিদেশী ডাচ্ শিল্পী যে-কোন কারণেই হোক সেই নিখোঁজ ইতালিয়ান মেয়েটিকে গুম খুন করেছে। এখন তার দেহটা খণ্ড-খণ্ড করে বাড়ির ভিতরেই পুড়িয়ে ফেলেছে।

---

* এখানে কার্টুন মানে ব্যঙ্গচিত্র নয়। চিত্রশিল্পে cartoon শব্দটি দ্বিতীয় এক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কোন বড় মাপের ছবি আঁকতে হলে চিত্রশিল্পী অন্য একটা কাগজে সমমাপের একখানি আউট-লাইন আঁকেন। তাকেও বলে 'কার্টুন'। মূল ছবিতে যাতে বেশি রবার ঘষতে না হয় তাই এ আয়োজন। 'কার্টুন' থেকে মূল ক্যানভাসে (প্রাচীরচিত্রের ক্ষেত্রে দেওয়ালে) ঐ আউটলাইন কপি করে নেওয়া হয়।



সার্চ-ওয়ারেন্ট নিয়ে ওরা প্রিমাভেরা'তল্লাসী করল। দেখল, আর্টিস্ট নানান জাতের রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে কী-এক অদ্ভুত গবেষণা করছে। নানান-রকম নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে গেল পুলিস। ল্যাবরেটরি-বিশ্লেষণে জানা গেল, প্রত্যেকটিই ইন্‌অর্গ্যানিক সল্ট—জান্তব পদার্থ নয়।

কান ঘেঁষে বেঁচে গিয়েছিল সেবারও—।

এবার নতুন জাতের সমস্যা।

তেলরঙ পুরোপুরি শুকিয়ে উঠ্‌তে সময় নেয় বিশ-পঞ্চাশ বছর। মীগেরেঁ আবিষ্কার করল—হ্যাঁ আবিষ্কার বইকি—তেলরঙ আঁকা ছবির উপর যদি হাল্কা করে এক কোট পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড প্রলেপ দেওয়া যায়, আর তারপর ঘণ্টা-ছয়েক একশ পাঁচ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে ঝল্‌সে নেওয়া যায়, তাহলে সব-জাতের তেলরঙই সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। আর ঐভাবে দ্রুতগতিতে শুকিয়ে ওঠার ফলে ঊর্ণনাভ-চিহ্নের মতো ছবিতে দেখা দেবে কিছু চুলফাটের দাগ—যা নাকি দু-তিন শ বছরের পুরানো ছবির একটি আবশ্যিক সনাক্তিকরণ চিহ্ন।

সব কাজ যেদিন শেষ হল সেদিন ও বসল নিজের দুর্গ নিজেই বিচূর্ণ করতে। এখন তার দ্বৈতসত্তা! একাধারে চিত্র-বিক্রেতা এবং আর্টকনৌশর!

এমন কোনও হাতিয়ার আছে কি—ললিতকলা অথবা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের এক্তিয়ারে যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, এটি 'অরিজিনাল ভেরমেয়ার' নয়? ভেরমেয়ারের কম্পোজিশান, আলো-ছায়ার লুকোচুরি, তুলির টান, ম্যানারিজম্, কোথাও কোন ফাঁক আছে কি? ভেরমেয়ার দেওয়ালে পেরেক-পোঁতার অকথিত কাহিনী এঁকেছিলেন—মীগেরেঁ তেমনি এঁকেছেন জামার হাতায় সীবনশিল্পীর সুনিপুণ ছুঁচের ফোঁড়! আলো বামপ্রান্ত থেকে, আলো-ছায়ার মিতালী নিখুঁত, চিত্রের বামপ্রান্তে একটি বাতায়নের আভাস। ছবি তো নয়, যেন ভেরমেয়ার-রসে টইটম্বুর এক থোকা আঙুর। ললিতকলা মেনে নেবে তা।

বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যাও হার মান্‌বে। ফ্রেমের কাঠের এক-চিল্‌তে ভেঙে নিয়ে পরীক্ষা করাও, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী রায় দেবেন—যে গাছের ডাল থেকে ঐ ফ্রেমের কাঠ তৈরী হয়েছে সেই বৃক্ষের মৃত্যু হয়েছে দু-তিন শতাব্দী আগে। ব্যবহৃত পেরেকগুলোর গায়ে জমে-ওঠা মরচেও তাই বলবে। রঙের কাঠিন্য, গভীরতা, চুলফাটের দাগ দেখেও কেউ বলতে পারবে না এটা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আঁকা।

না! নিজের দুর্গ নিজেই ভেদ করতে পারল না মীগেরেঁ।

হেসে উঠ্‌ল আপন মনে।

তৎক্ষণাৎ ধমক দিল নিজেকে : বোকার মত দাঁত বার করে হেস না! যুদ্ধজয় এখনো হয়নি। সামনেই তোমার শেষ পরীক্ষা! ডক্টর আব্রাহাম ব্রেডিউস-এর অভিজ্ঞ তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে এখনো ফাঁকি দেওয়া বাকি। এমন কায়দায় বঁড়শিতে-গাঁথা টোপটা বুড়োর নাকের ডগায় বাড়িয়ে ধরতে হবে যাতে লোভী বুড়োটা টপ্ করে গিলে ফেলে। অমনি হ্যাঁচ্‌কা টান : খ্যাঁ- চ!

অতি ধুরন্ধর সে। সরাসরি হাজির হল না ডক্টর ব্রেডিউস-এর কাছে। সে বরং এসে হাজির হল ডক্টর বুন-এর চেম্বারে। তারিখটা ত্রিশে আগস্ট, 1937। ডক্টর জি. এ. বুন আমস্টার্ডামের একটি বিখ্যাত সলিসিটার্স ফার্মের সিনিয়ার পার্টনার। অত্যন্ত মানী ব্যক্তি। অগাধ সম্পত্তির

মালিক, ততোধিক সামাজিক প্রতিষ্ঠার অধিকারী। সে-সময়ে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পার্লামেন্টেরিয়ান। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি আর্ট-ল্যাভার : চিত্রপ্রেমিক। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহটি দেখবার মতো। মীগেরেঁ তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হল। এবং অচিরে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেল।

সেই সন্ধ্যায় হান মীগেরেঁ বুনকে শুনিয়ে দিল একটা অদ্ভুত আষাঢ়ে গল্প :

হল্যান্ডের ওয়েস্টল্যান্ড অঞ্চলে তিন-চার শ বছর আগে ছিল একটি দুর্গ। রাষ্ট্রবিপ্লবে বিপন্ন দুর্গাধীপ সপরিবারে পালিয়ে যান ইতালীতে। সঙ্গে নিয়ে যান যা পারেন। তাঁর সংগ্রহে নাকি অনেক-অনেক দুর্লভ চিত্র ছিল ওল্ড মাস্টার্সদের : হল্বেন, এল গ্রেকো, রেম্‌ব্রান্ট, ফ্রান্স হাল্‌জ্ প্রভৃতি। ঐ রাজবংশের অধস্তন এক অষ্টাদশী— তার নাম 'মাভ্‌রোখ্'—বর্তমানে মীগেরেঁর গোপন প্রণয়িনী। মেয়েটি বিবাহিতা, তার স্বামী ও একটি সন্তান আছে ইতালীর মিলানে। বংশের আদিপুরুষ হল্যান্ড থেকে যে সম্পত্তি ইতালীতে নিয়ে এসেছিলেন তার ভিতর ছিল প্রায় দেড়শ মাস্টারপিস্। মীগেরেঁ নিখুঁত হতে চাইল; নোটবই দেখে বল্‌লে—খাতাপত্রের হিসাব মতো তিনি নিয়ে এসেছিলেন একশ বাষট্টিখানি ছবি, কিন্তু বাস্তবে হিসাব পাওয়া যাচ্ছে একশ সাঁইত্রিশটির। ভাগ হতে হতে মাভ্‌রোখের হেপাজাতে এসেছে খান-সাতেক প্রাচীন চিত্র। কোনটা কার আঁকা সে জানে না। তার ভিতর খান-তিনেক লুকিয়ে নিয়ে মেয়েটি সীমান্ত পার হয়ে ফ্রান্সে এসেছে। জানাজানি হলে ফ্যাসিস্ট সমর-নায়কেরা ওকে গুলি করে মারত । কারণ বেনিতো মুসোলিনী ফতোয়া জারী করে রেখেছে যে, জাতীয় সম্পদ বিদেশে পাচার করার চেষ্টা করলে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হবে! সেই তিনখানি ছবির ভিতর একখানি নিয়ে মেয়েটি এসেছিল মীগেরেঁর কাছে। কার আঁকা ছবি, কত দাম হতে পারে সে কিছুই জানে না। মীগেরেঁ ছবিখানি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়; কারণ তার মনে হয়, এটি 'ভেরমেয়ারের অরিজিনাল'! মেয়েটি এখনো সে-কথা জানে না। তবে সত্যি যদি তাই হয়, তাহলে মীগেরেঁ তার প্রণয়িনীকে বঞ্চিতা করবে না । ন্যায্য কমিশন কেটে নিয়ে সব অর্থই সে মাভ্‌রোখকে দেবে। মীগেরেঁ দীর্ঘ কাহিনীর অন্তে বলে, আপনি, স্যার একবার কাইন্ডলি দেখবেন?

বুন নড়ে-চড়ে বসলেন। বললেন, আমি ছবি ভালবাসি। অনেক বিখ্যাত ছবি আছে আমার সংগ্রহে। তবে খোলা কথাই বল্‌ছি বাপু, আমি শিল্পবিশারদ নই, চিত্রপ্রেমিক মাত্র। যাহোক, তোমার গল্পে আমি উৎসাহিত হয়েছি। ছবিখানা দেখাতে পার?

পরদিনই মীগেরেঁ তার সদ্যসমাপ্ত 'অরিজিনাল ভেরমেয়ার'খানা বগলদাবা করে হাজির হল ডক্টর বুন-এর চেম্বারে। বুন মুগ্ধ হয়ে গেলেন ছবিটি দেখে। অবাক বিস্ময়ে অনেকক্ষণ সেটির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এটি অরিজিনাল ভেরমেয়ার!

মীগেরেঁ ন্যাকা সেজে বললে, ছবিটা দেখে প্রথমটা আমারও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু একটা বিরাট খট্‌কা আছে, স্যার !

— কী খট্‌কা? কোথায় সন্দেহ হচ্ছে তোমার?

— আমি স্যার যতদূর জানি, ভেরমিয়ারের ছবিতে দু-জাতের স্বাক্ষর পাওয়া গেছে। হয় M অক্ষরের মাথায় I-অক্ষরটা অথবা 'আই'-এর পরে ফুটকি দিয়ে 'এম' অক্ষরের সম্মুখে একটা অহেতুকী আঁকড়ি। কোন ছবিতেই ওঁর স্বাক্ষরে শেষ 'F' অক্ষরে এমন ঢেউখেলানো লেজুড় নেই। আপনি কাগজ-পেন্‌সিল দিন, আমি এঁকে দেখাই।

ডক্টর বুন কাগজ-পেনসিল্ এগিয়ে দিলেন। মীগেরেঁ দুটি স্বাক্ষর আঁকল পাশাপাশি :



অথবা

ডক্টর বুন উঠে গেলেন। বইয়ের আলমারি থেকে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বার করে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, না হে মীগেরেঁ। তোমার ধারণাটা ভুল। ভেরমেয়ার তিন জাতের স্বাক্ষর করেছেন তাঁর ছবিতে। শেষ 'আর' অক্ষরে ঢেউ খেলানো লেজুড় সমেত স্বাক্ষরও পাওয়া গেছে। এই দেখ :

প্রামাণিক গ্রন্থে দেখা গেল ছবিটা :

মীগেরেঁ চুপ করে গেল। বুন বললেন, স্বাক্ষরটা বড় কথা নয়, মীগেরেঁ! সই-জাল অনেকেই নিখুঁতভাবে করতে পারে। কিন্তু ভেরমেয়ারের তুলির টান— টোনাল এফেক্ট অননুকরণীয়। আমি প্রায় নিঃসন্দেহ, এটি সেই মহাশিল্পীরই স্পর্শধন্য। তা সত্য হোক না হোক, এ ছবিখানি আমি কিনব— আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার জন্য। এটি একটি অসামান্য ক্যানভাস! কিন্তু কাকে দিয়ে পরীক্ষা করাই?

মীগরেঁ তিন-চারজন শিল্প-বিশারদের নাম করল, আসল ব্যক্তিটির নাম এড়িয়ে। বুনের পছন্দ হল না। বললেন, ভেরমেয়ার-বিষয়ে অবিসংবাদিত অথরিটি হচ্ছেন ডক্টর অ্যাব্রাহাম ব্রেডিউস্। কিন্তু তিনি এখানে নেই। আছেন মোনাকোতে।

- সে তো অনেক দূরের পথ, স্যার । তার চেয়ে বরং...

বুন হাসলেন। বললেন, আমি বুঝতে পারছি মীগেরেঁ, তুমি কেন ডক্টর ব্রেডিউস্‌কে এড়িয়ে যেতে চাইছ। পথটা দূর বলে নয়। অন্য একটা কারণে! তাই নয়?

— কী কারণ স্যার?

— ব্যাপারটা আমি জানি। সেই তোমার রেস্টোর-করা ফ্রান্স হাল্‌জ্-এর ক্যাভেলিয়ারখানার কথা তুমি ভুলতে পারনি বলেই। সেখানা সত্যই হয়তো ছিল হাল্‌জ্-এর অরিজিনাল। কিন্তু উপায় নেই, মীগেরেঁ। আজকের দুনিয়ায় কোন 'ভেরমেয়ার' আবিষ্কৃত হলে তা ডক্টর ব্রেডিউস্‌কে দিয়ে পরীক্ষা করাতেই হবে। তিনি যতক্ষণ না সার্টিফাই করছেন, পৃথিবী সেটাকে মেনে নেবে না।

মীগেরেঁ অসহায়ের ভঙ্গিতে 'শ্রাগ' করল শুধু।

— না! আমি কোন রিস্ক নিতে পারি না। এটা বিশ্ব-ললিতকলার ব্যাপার! নতুন একখানা ভেরমেয়ার আবিষ্কৃত হওয়া মানে 'ওয়ার্ল্ড-নিউজ' ! বিশেষ, এটি বাইবেল-অবলম্বনে তাঁর দ্বিতীয় চিত্র। আমি নিজেই যাব ফ্রান্সে, মোনাকোতে। ছবিখানা নিয়ে। তুমিও চল। সব খরচ

আমার।

মীগেরেঁ বেঁকে বসল, না স্যার, আমি নেপথ্যে থাকতে চাই। মাভ্‌রোখ্‌-এর স্বামী আমাকে সন্দেহ করে। সে জানে, মেয়েটি ছবিখানা নিয়ে ইতালী থেকে ফ্রান্সে এসেছে। কোথায় আছে তা সে জানে না। এ ছবির প্রসঙ্গে আমার নামটা কিছুতেই যেন না উঠে পড়ে!

— তবে মাভ্‌রোখ-কেই আমার কাছে নিয়ে এস।

— সে তো আরও অসম্ভব, স্যার! সে যে ইতালীর সীমান্ত থেকে ওটা লুকিয়ে এনেছে। এই নতুন ভেরমেয়ার প্রসঙ্গে যদি মাভরোখের নামটা উঠে পড়ে, তাহলে ফ্যাসিস্ট-ইতালীতে ওর স্বামী আর সন্তানের উপর অকথ্য অত্যাচার হবে।

বুন চিন্তায় পড়লেন। বলেন, কিন্তু আমি তাহলে ডক্টর ব্রেডিউসকে কী বলব ? কোথায় এখানা পেয়েছি ?

— বলবেন, আপনার একজন মক্কেল অর্থনৈতিক বিপাকে পড়ে তার যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি বেচে দিতে চাইছে, স্থাবর সম্পত্তি বাঁচাতে। ঐ অস্থাবর-সম্পত্তির মধ্যে আছে এই ছবিখানি—যেটি দেখে আপনার সন্দেহ হয়েছে এটি 'অরিজিনাল ভেরমেয়ার' হলেও হতে পারে। তা যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে এই একখানি মাত্র ছবি বিক্রি করেই মক্কেল তার সব দেনার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। আপনি ডক্টর ব্রেডিউস্‌-এর সাহায্যপ্রার্থী। প্রফেশনাল এথিক্স অনুযায়ী মক্কেলের নাম আপনি ডক্টর ব্রেডিউসকে জানাতে পারছেন না। তা উনি জিজ্ঞাসাও করতে পারেন না। তাই নয় কি ?

ডক্টর অ্যাব্রাহাম ব্রেডিউস-এর বয়স তখন আশীর উপর। বুনের কাহিনীটি তিনি মন দিয়ে শুনলেন। ছবিখানি দেখতে চাইলেন। ক্রেট খোলা হল। সামনের দেওয়ালে, আলোর সম্মুখে ঝুলিয়ে দেওয়া হল ছবিটা। বৃদ্ধ শিল্প-বিশারদ নির্নিমেষ-নয়নে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন বহুক্ষণ! তাঁর চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। ক্রমে বলিরেখাঙ্কিত দুগালে নেমে এল জলের ধারা!

পুরো দশ-মিনিট পরে বাক্য-নিঃসরণ হল তাঁর সিক্ত কণ্ঠ থেকে : ডক্টর বুন ! আমি নিঃসন্দেহ : এটি অরিজিনাল ভেরমেয়ার!

— আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল।

— সন্দেহ-টন্দেহ নয়, ডক্টর বুন। এ আমার স্থির-সিদ্ধান্ত! দেখছেন না— যীসাস্‌-এর মুখখানা! আর কারও তুলিতে ও জিনিস ধরা দিতে পারে? যীসাস্‌ জীবিত, অথচ মৃত! তাঁর করুণাঘন আনত নয়নে স্নিগ্ধ শান্তি; কিন্তু তাঁর রুক্ষ-চুলে, বিশীর্ণ অধরে, রক্তশূন্য গাত্রবর্ণে কফিনের স্বাক্ষর! যেন মৃত্যু মহাতীর্থ অতিক্রমণে 'রেজারেক্‌শান' হয়েছে মানবত্রাতার! এটি ভেরমেয়ার-এর শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির অন্যতম।

— আপনি তাহলে সার্টিফাই করে দেবেন ?

উচ্ছ্বাস উপে গেল। রুমাল দিয়ে চশমার কাচটা মুছলেন প্রফেশনাল আর্ট-কনৌশার। বললেন, আপনি যদি লিখিত সার্টিফিকেট চান, তাহলে ছবিখানা আমার কাছে রেখে যেতে হবে। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষা না করে লিখিত সার্টিফিকেট দিতে পারি না; আর আমার প্রফেশনাল 'ফি'টা—

— জানি স্যার। রেটটা আমার জানা। আমাদের সৌভাগ্য যে আপনি বর্তমান এবং আপনার দৃষ্টিশক্তি অক্ষুন্ন আছে। 'রিটেইনার ফি'টা আপনার সেক্রেটারিকে দিয়ে যাচ্ছি। বলুন কবে আসব ?



— আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে। বেশি সময় নিতে সাহস পাই না। 'আশী' পার করেছি তো!

— সেকি কথা, স্যার! আপনি শতায়ু হবেন। তাহলে পর্শু ?

— হ্যাঁ, তাই!

তাই এলেন উনি। এসে দেখলেন, ডক্টর ব্রেডিউস ইতিমধ্যে স্থানীয় ফটোগ্রাফারকে দিয়ে ঐ ছবির একটি আলোকচিত্র বানিয়েছেন—দশ ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি। তার পিছনে স্বহস্তে লিখে দিয়েছেন :

> "ভেরমেয়ারের এই অনবদ্য চিত্রটি—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ডেল্ফ্‌ৎ-এর অনুকরণীয় জাঁ ভেরমেয়ার-এর (1632-75), শিল্পজগতে যাঁর অভিধা : 'The Sphinx of Delft'—আঁকা 'ইম্মেয়ুস্‌ সরাইখানায় প্রভু' যে আমার জীবদ্দশায় আবিষ্কৃত হল, এতে আমি ধন্য। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তিন শতাব্দী পরে রেজারেক্‌টেড যীসাস্‌-এর আবার রেজারেক্‌শান হল! তৈলচিত্রটি অসূর্যম্পশ্য (ইংরাজী অনুবাদে বলা হয়েছে undefiled ; ডঃ ব্রেডিউস্‌ যে মূল ডাচ-শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে 'ongerept' -ভাষাবিদ পণ্ডিত বর্তমান লেখককে জানিয়েছেন যে, তার অর্থ : অস্পর্শিত, virgin। বোধহয় ডক্টর ব্রেডিউস্‌ বলতে চেয়েছিলেন যে, বিগত তিনশ বছরে কোনও রেস্টোরেটরের তুলিস্পর্শে মূল ছবিখানির সতীত্বহানি হয়নি।) ভেরমেয়ারের এ জাতীয় অনবদ্য ছবি আমি ইতিপূর্বে দেখিনি। ছবিখানা প্রথম দেখে আমার যে অনুভূতি হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আমার দু-চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। কারণ মানবত্রাতার এই দ্বিতীয় আবির্ভাব আমার প্রত্যাশিত, আকাঙ্ক্ষিত, এবং ইতিপূর্বে ভবিষ্যদ্বাণীতে ঘোষিত। আমি ধন্য যে, আমার ভবিষ্যদ্বাণী আমার জীবদ্দশাতেই সত্য প্রমাণিত হল। কম্পোজিশন, ভাবের অনুরণন, রঙের ব্যবহার, টোনাল এফেক্ট—সব কিছু মিলিয়ে ভেরমেয়ারের এই তৈলচিত্রটি বিশ্বললিতকলার এক অনবদ্য দুর্লভ সংযোজন।—
>
> অ্যাব্রাহাম ব্রেডিউস, সেপ্টেম্বর, 1937"।

বুন নিজেই ছবিখানা কিনে নিলেন।

পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার গিল্ডার্সে!

অনতিবিলম্বে বিশ্বের যাবতীয় বিখ্যাত আর্ট-জার্নালে সংবাদটি পরিবেশিত হল। ডক্টর ব্রেডিউস ও বুনের উৎসাহে দর্শক-সাধারণকে সেই অনবদ্য চিত্রটি দেখানোর জন্য একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হল। রটার্ডামের প্রখ্যাত বয়ম্যান্‌স্‌ সংগ্রহশালার প্রদর্শনী-কক্ষে। সেদিন আমস্টার্ডাম, হার্লেম, উত্রেচ, দ্য হেগ, আর ডেলফ্‌ৎ থেকে হাজার হাজার উৎসাহী দর্শক আর চিত্রসমঝদারেরা ভীড় করে এসে উপস্থিত হলেন রটার্ডামের ঐ চিত্রশালায়। এমনকি বিদেশ থেকেও উড়ে এলেন বিত্তশালী উৎসাহীর দল। আর্ট-মন্ত্রকের মাননীয় মন্ত্রী-মহোদয় চিত্রটির আবরণ উন্মোচন করলেন। সমবেত দর্শকদল নতজানু হল 'রেজারেক্টেড' যীসাসকে দেখে। ডক্টর অ্যাব্রাহাম ব্রেডিউস্‌ মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিলেন। কোন্‌ কোন্‌ সূত্র ধরে প্রমাণ করা যায়—এ চিত্রটি ভেরমেয়ার ছাড়া আর কারও তুলিস্পর্শে মূর্ত হতে পারে না! চিত্রটির এক শৈল্পিক বিশ্লেষণ করলেন তার গুণকীর্তন করতে, যাকে বলে 'ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশান।' মুহুর্মুহু করতালিধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল সভাগৃহ।

সব শেষ হলে ব্রেডিউস যখন মন্ত্রীমহোদয়কে ছবির মর্মার্থ বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তখন কে-একটা ফালতু লোক ভীড়ের পিছন থেকে বলে উঠেছিল : যীসাস্-এর মুণ্ডুটা কিন্তু ক্যাডাভ্যারাস, মরা মানুষের! আদৌ জীবন্ত মনে হয় না! বিশ্বাস হয় না— ভেরমেয়ার এমন নির্জীব মুণ্ডু এঁকেছেন?

ডক্টর ব্রেডিউস জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। মন্ত্রীমহোদয়ের দেহরক্ষী তা দেখে ভীড়টা হটিয়ে দিল। ব্রেডিউস্ জনান্তিকে ডক্টর বুনকে জিজ্ঞাসা করেন, ঐ লোকটা কে বলুন তো? পিছন থেকে ফোড়ন কাটছিল? মুখটা চেনা-চেনা—

— ও স্যার একজন সামান্য রেস্টোরেটর, ওর নাম হান ভাঁ মীগেরেঁ!

— ও! চিনতে পেরেছি। ঐ ছোকরাই একদিন একখানা জাল-হাল্‌জ্ এনে সাচ্চা বলে চালাতে চেয়েছিল। এইসব ফালতু চ্যাঙড়াদের এজাতীয় প্রদর্শনীতে ঢুকতে দেন কেন?

## ।। নয় ।।

পুরো দুটি মাস লাগল জেলখানায় বসে ছবিখানি শেষ করতে। এক মাসে পারল না। কারণ ছিল। দুঃসাহসী শিল্পী নিজেই বিরাট পরিকল্পনা ফেঁদে বসেছিল। এই তার জীবনের শেষ ভেরমিয়ার : ''যুবক যীশু চিকিৎসকদের মাঝখানে''। ছবিখানার মাপ 38 ইঞ্চি × 75 ইঞ্চি। বেশ কয়েকজন শিল্পবিশারদকে সরকার নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন ছবিখানি দেখাতে। প্রেসকে কাছে ভিড়তে দেওয়া হল না। একমাত্র ব্যতিক্রম ফিগারো পত্রিকার একজন মহিলা সাংবাদিক। তাকে নিয়ে পুলিস কমিশনার-সাহেব 'সাপের-ছুঁচো-গেলা' অবস্থায় আছেন।

কাইজারগচ সড়কের সেই স্টুডিওটির সামনে সেদিন সারি সারি মটোর গাড়ি এসে পার্ক করেছে। পুলিস ঘিরে রেখেছে বাড়িটা। বৈঠকখানা ঘরে আলোর সামনে রাখা আছে প্রকাণ্ড তৈলচিত্রটি। একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। আগন্তুকেরা জানেন যে, ছবিখানা বন্দী মীগেরেঁ এই কারাগারে বসে এঁকেছে ভেরমেয়ার শৈলীতে। সে-খবরটা এখন লুকানোর চেষ্টা বৃথা । সকলে সমবেত হলে কাপড়ের আবরণটি সরিয়ে দেওয়া হল। একটা অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উঠল ঘরের এ-প্রান্তে, ও-প্রান্তে। শিল্পবিশারদের দল এগিয়ে এলেন। কাছ থেকে দূর থেকে, কখনও বা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করলেন ছবিখানা। চিত্রপটের মাঝখানে যুবক যীশু —তাঁর সমুখে একটি পাতা-খোলা প্রকাণ্ড গ্রন্থ। তাঁর বামে চারজন, দক্ষিণে চারজন পুরোহিত-চিকিৎসক। যথারীতি বাঁ-দিক থেকে আলো এসে পড়েছে; সেদিকে একটা বাতায়নের আভাস। শিল্পীর দৃষ্টিকোণ স্বাভাবিক ভেরমেয়ারী। মেঝে থেকে হাত দুয়েক উঁচুতে।

ক্লান্ত পলিতকেশ শিল্পী বসে আছেন কক্ষের একান্তে একটি সোফায়। ওঁর বয়স মাত্র আটান্ন; কিন্তু বার্ধক্যে জীর্ণ, দেখলে মনে হয় সত্তর! কিছুটা মার্ফিয়ার অভাবে, কিছুটা সাম্প্রতিক ঝড়ের প্রভাবে।

আর্ট-কনৌশার-এর দল ওঁর কাছে এগিয়ে এলেন এবার।

ওঁদের মুখপাত্র হিসাবে পলিককেশ এক বৃদ্ধ বললেন, মস্যুয়েঁ মীগেরেঁ। আমার কাছে যদি কোনও মক্কেল এই ছবিখানা খরিদ করার আগেই যাচাই করাতে নিয়ে আসত, তাহলে স্বর্গত ডক্টর ব্রেডিউস্-এর মতো আমিও লিখে দিতাম : এটি একটি অরিজিনাল ভেরমেয়ার! স্বীকার করি



: ভেরমেয়ারের 'ক্রাইস্ট অ্যাট ইম্মায়ুস'-এর তুলনায় এখানা নিকৃষ্ট, তবু...

কোথাও কিছু নেই অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল মীগেরেঁ।

বাও করে বললে, অনারেবল্ জাস্টিস আর্ট-কনৌশার, স্যার। অবজেক্‌শান! ভেরমেয়ার আদৌ কোনও 'ক্রাইস্ট অ্যাট ইম্মায়ুস' আঁকেননি! আপনি এখনো অবসেশনে ভুগছেন...

বৃদ্ধ হেসে বলেন, আয়াম সরি! তা ঠিক! আমি এখনো আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না!

মীগেরেঁ পুনরায় বাও করে বলেন, এক্সকিউজ মি সার্স! এবার আপনারা দয়া করে আসুন। ঘরখানা খালি করে দিন। এই একখানা ঘরই আমার স্টুডিও-কাম-প্রিজন সেল! আপনারা বিদায় হলে আমি একটু ঘুমাব। আমি বড় ক্লান্ত! আমার ঘুম পাচ্ছে!

সরকার নিয়োজিত এক্সপার্ট-এর দল মার্জনা ভিক্ষা করে বিদায় হলেন।

গেল না শুধু একজন। পুলিশ-সুপার।

ঘুম জড়ানো চোখে মীগেরেঁ তাঁকে বললেন, আপনি গেস্ট নন্, হোস্ট! তবু আপনাকেও বিদায় হতে বল্‌ছি। কিছু কি বলবেন?

— বলব! নাৎসী সমর-নায়কদের কাছে জাতীয় সম্পত্তি বিক্রয় করে দেবার অভিযোগ আমরা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি...

— আসাঁতে! আ'য়াম এঞ্চান্টেড। আমি অত্যন্ত আনন্দিত! তাহলে কি আমি মুক্ত? ঐ মেয়েটাকে নিয়ে নিজের বাড়ি যেতে পারি? ওর একখানা পোর্ট্রেট...

— আজ্ঞে না! আপনাকে এই মুহূর্তে নতুন করে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে মস্যুয়েঁ মীগেরেঁ। প্রবঞ্চনার অপরাধে। জাল ছবিকে আসল বলে চালিয়েছেন আপনি। ভেরমেয়ারের সইটাও জাল করেছেন। এগুলি জালিয়াতি—আন্ডার সেক্‌শান 326B.

মীগেরেঁ বজ্রাহত!

আবার পুলিস-ভ্যান। আবার জেল হাজত!

## ।। দশ ।।

তিনটি মাস পার হয়ে গেছে তারপর।

ইতিমধ্যে অ্যাগ্‌নেস বার-কতক পারী গেছে এবং আমস্টার্ডামে ফিরে এসেছে। মীগেরেঁ কারাগারে পুনরায় নিক্ষিপ্ত হবার পর অ্যাগ্‌নেসের পক্ষে তাঁর ঘনিষ্ঠ হওয়া আর সম্ভবপর হচ্ছিল না। অবশ্য পুলিস-কমিশনার-সাহেবের অনুমতি মোতাবেক প্রায় প্রতিদিনই বন্দীদের সাক্ষাৎ-সময়ে সে জেলখানায় দেখা করতে আসে। কমিনার-সাহেব এজন্য একটি বিশেষ 'পাস' দিয়েছেন তাকে দু-তরফা চাপে পড়ে। প্রথমত ভ্যালেরিয়াম ক্লিনিকের চিকিৎসকের নির্দেশে। বন্দীর স্বাস্থ্য অতি দ্রুত ভেঙে পড়েছে। হয়তো বিচার শেষ হবার আগেই তার মৃত্যু হবে, যদি না সাবধান হওয়া যায়। মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার লক্ষ্য করে দেখেছেন— ঐ বিশেষ সাক্ষাৎকারিণীর সান্নিধ্যে বন্দীর বেঁচে থাকার ইচ্ছাটা প্রবলতর হয়। দ্বিতীয়ত ফিগারো-সম্পাদক লে লোরেনের সনির্বন্ধ-অনুরোধ কী জানি-কেন তিনি এড়াতে পারছিলেন না। তাই অ্যাগ্‌নেস মাঝে-মাঝে পারী অফিসে যেতে বাধ্য হলেও মোটামুটি ঐ 264নং প্রিন্‌সেনগ্রচ-এই ডেরা-ডান্ডা গেড়েছে।

পঁয়ক্যারেকে সে জন্য মেঝেতে শুতে হয় না আজকাল, ল্যান্ডলেডি তাবুর্গও কোন 'আতান্তরি'তে পড়েননি। এক-কামরার ঘরে ওরা দুজনে দিব্যি সংসার পেতেছে—বব্ আর অ্যাগ্নেস পঁয়ক্যারে। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে অ্যাগ্নেসের পদবীটার বদল হয়েছে। শ্যাম্পেন থেকে পঁয়ক্যারে।

সেদিন সন্ধ্যায় ওদের রাস্তার ধারের ঘরখানায় বসে অ্যাগ্নেস পঁয়ক্যারে তার দিনপঞ্জিকা লিখছে। বব্ গেছে পারী, আগামী কাল তার ফেরার কথা। ল্যান্ডলেডিও বাড়ি নেই, গেছে মার্কেটিঙ-এ। বে-উইন্ডোর আলোর নিচে টেবিলে দিনপঞ্জিকা লিখতে বসেছে অ্যাগ্নেস।

বে-উইন্ডোর উপরে গোটা-কয়েক ফুলের টব। একটাতেও কোন ফুলের চারাগাছ নেই—ফুল দূর-অস্ত্! অথচ এটা অক্টোবর মাস। আমস্টার্ডামের বাতায়নপথে এখন ফুলে-ফুলে রঙ্-বেরঙের হাতছানি দেখা পাবার কথা। গত চার-পাঁচ বছর গেছে শতাব্দীর ব্যতিক্রম। সমস্ত পাড়াটা যেন এখনও শ্মশান—এই প্রিন্‌সেনগ্রচ রাজপথটা। কারণ আছে। এটা ছিল ইহুদীদের এলাকা। জার্মান অধিকারের আগেই কিছু লোক পালিয়ে গেছে ইংল্যান্ডে — আমেরিকায়, অধিকাংশই গেছে কন্‌সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। তারা এখনো ফিরে আসেনি। দু-তিন বছর ধরে জনমানবশূন্য দু-তিনতলা বাড়ি তাদের অতীতের কলরবমুখরিত দিনগুলির স্বপ্নে আজও মৌন। কোন বাড়ির জানলার ছিটকানি হয়তো খুলে গেছে। উইন্ডমিল-দেশের ঝোড়ো হাওয়ায় সেই পাল্লাগুলি আজও অতীত বাসিন্দাদের দুঃখে বুকচাপড়ে কাঁদে। জানলার সামনেই যে তিনতলা বাড়িটা আছে. এই ক-মাসে সেখানে একদিনও আলো জ্বলতে দেখেনি।

অ্যাগনেসের দৃষ্টি জানলা থেকে নেমে এল ওর লেখার টেবিলে। সেখানে পাশাপাশি দুটি ছবি ফটো-স্ট্যান্ডে বাঁধানো। একটি তেলরঙের ছবি, একটি আলোকচিত্র। দুটির কম্পোজিশানই কিন্তু একই রকম। কারাভাগ্‌গো আর মীগেরেঁর 'ইম্মেয়ুস' ক্যানভাসে কম্পোজিশানের যে সাদৃশ্য তার চেয়েও বেশি। দুটি ছবিতেই দেখা যাচ্ছে পশ্চাদপটে একটি গীর্জা আর তার সামনের সিঁড়িতে বসে আছে একটি রমণী। তেলরঙের ছবিটায় মেয়েটির পোশাক-পরিচ্ছদ সাদামাটা; ফটোখানায় সে ওয়েডিং-গাউন পরে! প্রথমখানি অ্যাগ্নেসের মায়ের কাছ থেকে পাওয়া, দ্বিতীয়খানি অ্যাগ্নেসের অনুরোধে বব্ তুলে দিয়েছিল রটার্ডাম সেন্ট মেরী চার্চে—ওর বিয়ের দিন!

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল আগ্নেসের।

সেই কথা দিয়েই শুরু করল আজকের রচনা :

264, প্রিনসেনগ্রচ/আমস্টার্ডাম<br>দোশরা অক্টোবর' পঁয়তাল্লিশ

''রঙের যে টেক্কাখানার দৌলতে শেষ-পিঠ তুলব বলে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, এখন দেখছি তার কোনও দামই নেই। যেন ভেরমেয়ারের স্বাক্ষরিত ছবি, প্রমাণিত হয়ে গেল প্রবঞ্চকের আঁকা বলে! ইতিমধ্যে রঙ বদলে গেছে। দামটাও! আমার সত্যিকারের পরিচয় ওঁকে আর কোনদিনই জানানো যাবে না। সেদিন কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা, আপনি যা বলছেন, তাতে 'মাভ্‌রোখ্' নামে কেউ কোনদিন ছিল না—ওটা আপনার মনগড়া একটা নাম। অথচ শুনেছি. আমস্টার্ডাম-পুলিস বলছে ফ্রেঞ্চ-পুলিসের সূত্র থেকে ওরা জেনেছে যে, 'লা ম্যাগ্নিফিক' থেকে একটি মেয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিল, হোটেলের খাতায় তার নাম লেখা আছে 'মাভ্‌রোখ্'। এটা কেমন করে হল?

'উনি অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, জানি না!



''—আমি কিন্তু জানি।—বলেছিলাম আমি।

''আমি নিশ্চিত, ছয়মাস আগে হলে উনি লাফিয়ে উঠ্‌তেন। বলতেন— তুমি! তুমি কী করে জানলে? কী জান তুমি?

''তার বদলে উনি শুধু বললেন, ও!

''কোনও কৌতূহল নেই এ বিষয়ে! বন্দীজীবনে ওঁর বিরাট একটা মানসিক পরিবর্তন হয়ে গেছে এ-কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। দুনিয়ার উপর উনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন। কোন কিছুতেই উৎসাহ বোধ করছেন না। বাঁচবার ইচ্ছাটাই যেন আর নেই।

''অথচ বব্‌কে সেদিন ঐ-কথাটা বলতে সে লাফিয়ে উঠেছিল। বলেছিল, মীগেরেঁ-এপিসোডের ঐ একটা সমস্যার সমাধানই আমি খুঁজে পাইনি। তুমি পেয়েছ? কী করে পেলে?

''আমি বলি, কী করে পেলাম, তা বল্‌ছি, কিন্তু সমস্যাটা কী, বুঝিয়ে বল তো?

''—মসুয়েঁ মীগেরেঁ বলছেন, 'মাভ্‌রোখ' নামটা তিনি বানিয়েছেন অথচ ডাচ্-ইন্টেলিজেন্স-এর খবর 'লা ম্যাগ্নিফিক' থেকে যে মেয়েটি হারিয়ে গিয়েছিল তার নাম 'মাভ্‌রোখ'। এমন কাকতালীয় ঘটনা কেমন করে ঘটল? সমস্যা তো এটাই।

''—শোন, বুঝিয়ে বলি। মসুয়েঁ মীগেরেঁ মিথ্যা বলেননি। ভুলটা হয়েছে ডাচ্-ইন্টেলিজেন্স-এর। 'লা-ম্যাগ্নিফিক্ থেকে মাভ্‌রোখ নামের মেয়েটি নিরুদ্দেশ হয়েছিল অনেক পরে। মসুয়েঁ মীগেরেঁ রোকেব্রুনে ছিলেন 1936 থেকে 1938। উনি নাইস্-শহরে চলে যান পরের বছর, 1939-এর জুন মাসে। যে ইতালিয়ান-মেয়েটি ওঁর রোকেব্রুন অবস্থানকালে জলে ডুবে মারা যায়, তার নাম 'মাভরোখ' ছিল না। 'লা-ম্যাগ্নিফিক্' থেকে যে-মেয়েটি চেক্-আউট না করে পালিয়ে যায়—যে রেজিস্টারে 'মাভ্‌রোখ' নামটা লিখেছিল, সে রোকেব্রুন-এ এসেছিল 1939-এর অক্টোবর-এ।

''— সে মেয়েটিই বা কে? সে কেন এসেছিল রোকেব্রুনে? আর রাতারাতি পালিয়েই বা গেল কেন? তুমি জানো?

''— জানি। সে রোকেব্রুনে গেছিল তার বাপের খোঁজে। তিন চার বছর বয়সে সে বাপকে হারিয়েছিল। মায়ের সঙ্গে চলে গেছিল পৃথিবীর অপরপ্রান্তে, ডাচ্-ইন্ডিজের ব্যাটাভিয়ায়। তাই ইউরোপে ফিরে এসে দুরন্ত কৌতূহলে সে খুঁজছে তার হারানো বাপিকে। তার মা নেই, দাদা শহীদ হয়েছে, এ দুনিয়ায় আত্মীয় বলতে একমাত্র তার বাবা। প্রথমে গিয়েছিল হল্যান্ড। সেখানে গিয়ে শোনে, তার বাবা সস্ত্রীক চলে গেছেন ফ্রান্সে। আছেন সেখানকার রোকেব্রুন শহরের 'প্রিমেভরায়'। ইতিমধ্যে ডাচ-পুলিস তার পিছনে লেগেছে। মেয়েটি লুকিয়ে হল্যান্ড থেকে পালিয়ে গেল ফ্রান্সে। ডাচ্-পুলিসের ধারণা, ও হচ্ছে 'জিল'—জ্যাক মীগরেঁর প্রণয়িনী। প্রণয়িনী কেন? যেহেতু ওরা খবর পেয়েছে জ্যাক আর জিল বারে বারে একই হোটেলে উঠেছে, একই ঘরে রাত্রিবাস করেছে। ওরা সন্দেহ করেনি—তার হেতু, ওরা আপন ভাইবোন। হল্যান্ডে ডাচ্-পুলিসের তাড়া খেয়ে ঈনেভ পালিয়ে গেল ফ্রান্সে। তখন সে ডাচ-পেইন্টার্সদের নিয়ে রিসার্চ করে। মীগেরেঁর বিষয়ে তার বিশেষ কৌতূহল। মাভ্‌রোখ নামটা পর্যন্ত জানে। রোকেব্রুন-এ এসে সে জানতে পারল ওর বাবা কয়েক মাস আগে 'প্রিমেভেরা' ছেড়ে চলে গেছেন ইতালীতে নাইস্-শহরে। যেখানে যাওয়ার সাহস কায়নি, কারণ ততদিনে বিশ্বযুদ্ধ ঘনিয়ে উঠেছে। ইতালী নিশ্চিত থাকবে মিত্রপক্ষের বিপরীত ক্যাম্পে!

'' বব্ বুঝেছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল তার।

''সেই ছোট্ট ঈনেভ এতদিন পরে তার হারানো বাপিকে খুঁজে পেয়েছে! কিন্তু তার সেই তুরুপের টেক্কাটা আজ আর কোন কাজে লাগবে না। হান ভাঁ মীগেরেঁকে জানানো যাবে না, কেন প্রথম দিন অ্যাগ্‌নেসকে দেখে তাঁর মনে পড়ে গেছিল অ্যানার কথা!

'ইতিমধ্যে পুলিসে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করেছে। দেনার দায়ে। নকল ছবি বেচে তিনি যা উপার্জন করেছেন তার মূল্য প্রত্যর্পণ করতে বলা হয়েছে! তাঁর ঐ অতুল বৈভব দিয়েও সেই দামটা আজ মেটানো সম্ভবপর নয়। বৃদ্ধ তাই দেউলিয়া হবার জন্য দরখাস্ত করেছেন। সেজন্য কিন্তু উনি আদৌ ক্ষুব্ধ নন। বললেন, কার জন্য বিষয়সম্পত্তি রেখে যাব, মা? তিনকুলে আমার কে আছে যে যখের ধন আগলে রাখব? এ ভালই হল, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-আমার কেউ নেই, যার জন্য এই দেউলিয়া মানুষটা আজ লজ্জা পাবে।

''বলেছিলাম, আপনার স্ত্রী জোহানা...

''— না, না, তার কথা বল্‌ছি না। সে তো পালিয়ে বেড়াচ্ছে! তাকে যা দেবার তা তো দিয়েছি। পুলিস সে সম্পত্তির নাগাল পাবে না। আমি বলছি, অ্যানার কথা, জ্যাক আর ঈনেভের কথা।

''— অ্যানা আর জ্যাক মারা গেছেন শুনেছি; কিন্তু আপনার ছোট মেয়ে ঈনেভ তো একদিন এসে হাজির হতে পারে?

''— ঈশ্বরের কাছে এখন আমার ঐ একটিই প্রার্থনা—দেউলিয়া বাপকে লজ্জা দিতে সে হতভাগী না শেষ সময়ে এসে উপস্থিত হয়!

''— সে হতভাগী আজ আর তাই এসে উপস্থিত হতে পারছে না তার দেউলিয়া বাপের কাছে।''

হঠাৎ বাইরের ঘরে কলিং বেলটা বেজে উঠ্‌ল।

ল্যান্ডলেডি বোধহয় মার্কেটিঙ সেরে ফিরে এলেন। ঈনেভ ডায়েরীটা বন্ধ করে চলে এল বাইরের ঘরে। এতক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। প্রবেশপথের সুইচটা জ্বেলে সে সদর-দরজা খুলে দিল। ন, ল্যান্ডলেডি মিসেস্ তেবুর্গ নন। একজন অপরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক। কঙ্কালসার, দুর্বল। গায়ের কোট-প্যান্ট নিতান্ত বেঢপ। ভিক্ষুক নাকি?

— মসুঁয়ে তেবুর্গ কি বাড়িতে আছেন?

— মসুঁয়ে তেবুর্গ। না, নেই। তিনি তো বছরখানেক আগে মারা গেছেন।

— ও! মারা গেছেন? কী হয়েছিল তাঁর?

— আমি তাঁকে দেখিনি। শুনেছি বম্বিঙে। ঠিক জানি না।

— আর মাদাম তেবুর্গ?

— তিনি এখানেই থাকেন। এখন বাড়ি নেই। আপনি কি ভিতরে এসে বসবেন?

— না। মানে, আমি জানতে এসেছিলাম, ঐ সামনের বাড়িটায় কে তালা দিয়েছে? ওর চাবিটা কোথায় পাওয়া যাবে? ঐ যে, ঐ 263 নম্বর বাড়িটা।

বিশীর্ণ তর্জনী তুলে প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে থাকা অন্ধকার বাড়িটা দেখিয়ে দিলেন, প্রেতের মতো কঙ্কালসার মানুষটি।

— ও বাড়িতে কেউ তো থাকে না এখন। চাবি কে দিয়েছে জানি না। কেন বলুন তো?



— আমরা ওখানেই থাকতাম...ইয়ে, আপনার কাছে টর্চ আছে?

ঈনেভ বুঝতে পারে, ভদ্রলোক ইহুদী। নাৎসী অধিকারের সময়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এখন যুদ্ধান্তে ফিরে এসেছেন। সে একটি টর্চ নিয়ে এগিয়ে এল। সদর-দরজা বন্ধ করে পথে নামল। বলল, চলুন, আমি আলো নিয়ে সঙ্গে যাচ্ছি।

দরজায় তালা দেওয়া। কিন্তু বাড়িতে ঢুকতে অসুবিধা হল না। বোমা-বর্ষণে একটা বড়-জানলা ভেঙে গেছে। ভদ্রলোক ঈনেভকে সাহায্য করলেন জানলা টপকিয়ে ভিতরে ঢুকতে। বাইরের ঘরে সব কিছুই অবিন্যস্ত অগোছালো। চেয়ার-টেবিল বোমাবর্ষণের সময়ে ছিটকে পড়েছিল হয়তো—কেউ সেগুলি স্বস্থানে টেনে আনেনি আর। পিছনের দেওয়ালে একটা বুক কেস। তার পিছনে দ্বিতলে ওঠার চোরা কাঠের-সিঁড়ি। সহজে নজরে পড়ে না। প্রৌঢ় লোকটি নিশ্চয় তার অবস্থান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। ধ্বংসস্তূপ এড়িয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন দ্বিতলে। টর্চের আলো জ্বেলে পিছন পিছন ঈনেভও উঠ্‌ল। দ্বিতলে 'সেলার'—ঘরটার নিচু ছাদ। সেখানেও একটি টেবিল—উল্টে পড়ে আছে। দু-চারখানা চেয়ার, আর টুল, বেঞ্চি ইতস্তত ছড়ানো। ভদ্রলোক সেই জনশূন্য চোরা-কুটুরির দিকে তাকিয়ে থাকেন। কী যেন খুঁজছেন তিনি।

ঈনেভ বুঝতে পারে—উনি খুঁজছেন অতীত-স্মৃতি। পার্থিব কোনও সম্পদ নয়।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে উনি বললেন, চলুন, নিচে যাওয়া যাক।

নামবার পথে কিসে যেন হোঁচট খেলেন ভদ্রলোক। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিলেন জিনিসটা। ঈনেভ টর্চের আলো ফেলল তাঁর উপর। একটা বাঁধানো বই। না, বই নয়, একটা ডায়েরি মতন মনে হল। ওর হাত থেকে টর্চটা নিয়ে ভদ্রলোক সেটা দেখতে থাকেন।

ঈনেভ বলে, কী ওটা?

— একটা ডায়েরি। আমার মেয়ের লেখা। ওর দ্বাদশ জন্মদিনে ওকে আমিই উপহার দিয়েছিলাম। ও যে ডায়েরি লিখত, সেটাই জানা ছিল না। যাক, চলুন।

ওরা আবার জানলা গলিয়ে নেমে এল পথে।

ভদ্রলোক ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে চললেন ওয়েস্টারকার্কের দিকে। হঠাৎ থমকে পড়ে বললেন, মাদাম তেবুর্গকে বলবেন, আমি একাই বেঁচে ফিরে এসেছি। আমার নাম অটো ফ্রাঙ্ক। উনি না চিনতে পারলে বলবেন, Anne Frank-এর বাবা।

## ।। এগারো ।।

ভাঁ মীগেরেঁ সম্বন্ধে যতগুলি বই পড়েছি, তাতে একটা প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাইনি।

কেন তিনি প্রথম দিনই বলে দেননি, ''আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ 'যীশু ও পতিতা' ছবিখানা আমি অমুককে এত সালে বিক্রি করেছিলাম।''—তাহলেই তো তিনি সেদিন বিপন্মুক্ত হতে পারতেন। কারণ, তাঁর কাছে তো সেইটুকুই জানতে এসেছিল দুর্জঁ আর দুমা। বড় জোর তিনি আগ্ বাড়িয়ে বলতে পারতেন, 'আপনারা অহেতুক ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করছেন মশাই! — ঐ 'যীশু ও পতিতা' ছবিখানা আদৌ অরিজিনাল ভেরমেয়ার' নয়। সে-কথা আমি বুঝতেও পেরেছিলাম। এখনো 'রেডিওগ্রাফ' করলে দেখতে পারেন, ঐ ছবিটার নিচে একটা প্রাচীন যুদ্ধদৃশ্য আছে! ওটা নেহাৎ নকল ছবি! নাৎসী-চোরদের উপর কেউ যদি বাটপাড়ি করে থাকে, তবে তাকে

জাতীয়-সম্পদ বিক্রয়ের দায়ে ফেলা যায় না!'
তাহলেই সব লেঠা চুকে যেত। ওঁকে গ্রেপ্তার করার কোন প্রয়োজনই হত না। ঐ প্যারামিলিটারী ফোর্স-এর কাজ জাতীয়-সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা। যে মুহূর্তে ওরা জানতে পারত যে, অল্ট-ঔসী অঞ্চলে উদ্ধার পাওয়া 'যীশু ও পতিতা' খানা ভেরমেয়ারের আঁকা নয়, সেই মুহূর্তেই ওরা তদন্তে ক্ষান্ত হত। কোথায় কে জাল ছবি আঁকছে তা ধরা ওদের কাজ নয়।
কিন্তু তার বদলে হান মীগেরেঁ যে কাণ্ডটা করলেন তা অবিশ্বাস্য!
ছয়-সপ্তাহ অহেতুক সলিটারি-প্রিজন-এ আটক থেকে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়লেন। ভেঙে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক। সুখী মানুষ তিনি, অতুল বৈভবে অভ্যস্ত। নির্জন কারাগারের যন্ত্রণা, জেলের আহার্য-পানীয়, বিশেষ করে মর্ফিয়ার অভাব তাঁকে ভূতলশায়ী করেছে। কিন্তু এই সহজ পথটা, উদ্ধারের সরল উপায়টা কেন তাঁর নজরে পড়ল না?
সত্যি কথা বলতে কি, এটা যদি সত্য ঘটনা না হত, ইতিহাস না হত—অর্থাৎ মীগেরেঁ যদি ঔপন্যাসিকের একটা মনগড়া চরিত্র হত, তাহলে আমি সাহস করে ঘটনাটা লিখতে পারতাম না। ঐ রকম একজন ধুরন্ধর প্রবঞ্চকের পক্ষে মুক্তির এমন একটা সহজপথ খুঁজে না পাওয়া স্বাভাবিক নয়! যে কায়দায় তির্যকপথে ডক্টর ব্রেডিউসকে দিয়ে 'ইম্মেয়ুস পান্থশালায় যীশু' ছবিটির সার্টিফিকেট আদায় করেছিলেন তাতে তাঁকে পাকা প্রবঞ্চক বলতেই হবে—সেটা ইতিহাস। আবার যেভাবে তিনি ধরা দিলেন তা নির্বুদ্ধিতার চরম পরিচয়। বিস্ময়ের কথা—সেটাও ইতিহাস! উপন্যাসের চরিত্রে এই আপাত-অসঙ্গতি কেউ মেনে নিত না।
এই আপাত-অসঙ্গতির কথা ওঁর জীবনীকারেরা কিন্তু কোন আলোচনা করেননি। আমার যা মনে হয়েছে সেটা লিপিবদ্ধ করার আগে বরং বলি ভাঁ মীগেরেঁ সম্বন্ধে যে কয়খানি গ্রন্থ নাড়াচাড়া করেছি তাতে লক্ষ্য হয়েছে ওঁর প্রবঞ্চকের ভূমিকাটুকুই সবাই দেখেছেন ও দেখিয়েছেন! যদিও তাঁর আঁকা ছবি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রশালায় প্রদর্শিত হয়েছে তাঁর জীবিতকালে, লক্ষ লক্ষ ডলারে তা কেনা-বেচা হয়েছে, তবু চিত্রকর হিসাবে তাঁকে কোন সম্মান দিতে আর্ট-ইতিহাস অসম্মত। তাঁর শেষ চিত্র — যেটি জেলখানায় বসে তিনি এঁকেছিলেন —'যুবক যীশু', সেটি নিলামে বিক্রি হয়েছিল মাত্র তিনশত পাউন্ডে! নিলামে সেখানা কিনে নেন স্যার আর্নেস্ট ওপেনহাইমার—না, অ্যাটম-বোমা-খ্যাত সেই ব্যক্তিটি নন, ইনি ছিলেন দক্ষিণ-আফ্রিকার এক কোটিপতি হীরক ব্যবসায়ী, উদারচেতা সমাজসেবী। অপ্রয়োজন হলেও উল্লেখ করি, তাঁর পুত্র প্যারী ফ্রেডারিক এ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকেই দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছেন।
যাক, যে-কথা বলছিলাম—আর্ট-ইতিহাসে হান ভাঁ মীগেরেঁর পরিচয় শুধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবঞ্চক হিসাবে। তাঁর প্রামাণ্য জীবনীকার লর্ড কিল্‌ব্রাখেন গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "Han van Meegeren, beyond doubt, had been the most successful known forger of all time. He still is. That, for what it's worth, is his claim for immortal glory. His entire edifice had been constructed on a completely false value judgement. A man of integrity would have known this in his heart and it may be that van Meegeren knew it. He himself had been a fake, just as his Vermeers had been." [নিঃসন্দেহে হান ভাঁ মীগেরেঁ শিল্প-ইতিহাসের সর্বকালের



সর্বাপেক্ষা সাফল্যমণ্ডিত প্রবঞ্চক। আজও তিনি তাই। তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমার দাবীর এটুকুই মূল্যায়ন করা চলে। সে দাবী ধূলিসাৎ হয়েছে। তাই হয়। তাঁর প্রাসাদের বনিয়াদে আছে ভ্রান্ত মূল্যায়নের ধারণা। যেকোন সৎ লোক এ তত্ত্বটা অন্তরের অন্তঃস্তলে জানে; সম্ভবত ভাঁ মীগেরেঁও সেটা জানতেন। তাঁর আঁকা ভেরমেয়ারের মতো সেই মানুষটিও ছিলেন নকল।]
মীগেরেঁর উপর দ্বিতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থটি ডেকায়েন-এর লেখা (Back to the Truth, 1951 by M. Jean Decoen)। তিনি ছিলেন মীগেরেঁর অন্তিমবিচারে নিযুক্ত শিল্পবিশারদ দলের দলপতি। তিনি তাঁর গ্রন্থে ঐ ভ্রান্ত পথিকের জন্য করুণা করেছেন, অশ্রুপাত করেছেন, কিন্তু মীগেরেঁ যে কখনো কোন সার্থক ক্যানভাস এঁকেছেন এ-কথা মানতে গররাজি! এঁদের দুজনের একজনও কিন্তু মীগেরেঁর আঁকা কোন ছবিকে আসল বলে সার্টিফাই করেননি— অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত নয় তাঁদের বক্তব্য। অথচ মজার কথা, ঐ ডেকোয়েন 1946 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে—যখন পর্যন্ত নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়নি, যে, 'ইম্মেয়ুস পান্থশালায় যীশু' মীগেরেঁর আঁকা—একটি প্রখ্যাত আর্ট-জার্নাল La Lanterne-তে লিখেছিলেন, "The least that can be said of this affair is that we are here dealing with a sinister hoax. The picture in the Boyman's [i.e., The Emmaus], is a genuine work of the 17th century and is by Jan Vermeer of Delft. By painting the young Christ, van Meegeren proved decisively that it was not he who had executed the Emmaus." [এ ব্যাপারে অন্তত এটুকু বলা চলে যে, আমরা একটা শয়তান প্রবঞ্চকের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। বয়ম্যান সংগ্রহশালার চিত্রটি (অর্থাৎ মীগেরেঁর আঁকা 'ইম্মেয়ুস পান্থশালায় যীশু') সপ্তদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত। ডেল্‌ফ্‌ৎ-এর জাঁ ভেরমেয়ারের তুলির স্পর্শধন্য। জেলখানায় বসে ভাঁ মীগেরেঁ যে 'যুবক যীশু' ছবিখানা এঁকেছে তাতেই সন্দেহাতীতভাবে আজ প্রমাণ হয়ে গেল 'ইম্মায়ুস' তাঁর আঁকা নয়।]
ছেচল্লিশ সালে, মীগেরেঁ জেলখানায় বসে 'যুবক যীশু' শেষ করার পরেও যিনি এ-কথা লিখে আর্ট জার্নালে ছাপিয়ে দিতে পারেন, তিনিই ছিলেন আদালত নিযুক্ত আর্ট-কনৌশারদের মুখপাত্র! অবশ্য ভাঁ মীগেরেঁর সব কয়জন জীবনীকারই আহা-উহু করেছেন। প্রতিভার মৃত্যুতে, ঐ ভ্রান্তপথিকের জন্য চোখের জল ফেলেছেন। সহানুভূতি জানিয়েছেন!
কিন্তু শিল্পী কি সহানুভূতির কাঙাল? সে চায় স্বীকৃতি। চোখের জল ফেলা এক জিনিস, আর 'মাথার টুপি খোলা' অন্য জিনিস! শিল্পী— তা সে যে-কোন মাধ্যমের হোক—মঞ্চ, সিনেমা, যন্ত্র-কণ্ঠ সঙ্গীত, সাহিত্য—দ্বিতীয়টা চায়, প্রথমটা নয়। দেবদাস যদি শিল্পী হত, তাহলে শরৎবাবু তাঁর উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদটা অন্যভাবে লিখতেন! দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে শিল্পী জানতে চায় না—কারও চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে কি না! বরং সে জানতে চায়: কেউ মাথার টুপিটা খুলেছে কিনা। মৃত্যুপথযাত্রীর উদ্দেশ্যে, তার সৃষ্ট শিল্পের উদ্দেশ্যে। অন্তত আমি তো তাই বুঝি! নিজের অনুভূতি দিয়ে। আমি যদি খ্রীষ্টান হতাম, আর মাইকেলের মতো নিজের 'এপিটাফ' নিজেই লিখে যাবার সুযোগ আমার থাকত, তাহলে আমার কবরে এই কয়টি পংক্তি উৎকীর্ণ করার নির্দেশ রেখে যেতাম:

"When I am dead,
Let this may be said:

The man was but naught,
But his books were read!"

তাই অনুমান করতে পারি : কেন মীগেরেঁ-চরিত্রের ঐ আপাত-অসঙ্গতি! দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে সে বলে যেতে চেয়েছিল : তোমরা যে শিল্পীকে স্বীকৃতি দাওনি, তুচ্ছ করেছ, —হে মহান আর্ট-কনৌশারদল! সেই নিগৃহীত শিল্পীর ছবিই কিন্তু তোমরা কেনা-বেচা করেছ লক্ষ-লক্ষ ডলারে! সাজিয়ে রেখেছ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালায়! তোমার স্বেচ্ছায় দাওনি—আমি নিজেই স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছি।

এই কথাটা বলে বুকটা হাল্কা করতে চেয়েছিল! স্বেচ্ছায় তাই ছয়-সপ্তাহকাল বন্দীদশায় নির্যাতন সয়েছে, মর্ফিয়ার অভাবে দেওয়ালে মাথা খুঁড়েছে, তবু মুক্তির সহজপথটা বেছে নেয়নি! জানত—সত্য কথা স্বীকার করলেই তার সম্পত্তি ক্রোক করা হবে, সে দেউলিয়া হয়ে যাবে, হয়তো বাকি জীবন জেলে পচে মরতে হবে। হয় হোক, তবু সে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সব কিছু খুইয়েও সে শিল্পী-হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করে নিতে চেয়েছিল!

মানছি, তার আঁকা মৌলিক চিত্র স্বীকৃতি পায়নি। সবই অনুকরণ।

কিন্তু অনুকরণ মাত্রেই কি অপাংক্তেয়? ফিডিয়াস, প্র্যাক্সিটেলিজ-এর শিষ্যরা গুরুর কাজের যেসব অনবদ্য অনুকরণগুলি করেছিলেন তা তো আমরা সযত্নে সাজিয়ে রেখেছি পারীর লুভ-এ, আমসটার্ডামের রাইখ্ সংগ্রহশালায়? 'ভানুসিংহের পদাবলী' তো একটি বিশেষ যুগের শৈলীর অনুকরণে? সেখানেও তো কবি ছদ্মনামের আড়ালে আত্মগোপন করেছেন?

স্বীকার্য : অনুকরণ তখনই সার্থক যখন শিল্পী সে-বিষয়ে পূর্ব-স্বীকৃতি দিয়ে রাখেন। ক্ষেত্রবিশেষে তা পরেও দেওয়া চলে—যেমন দিয়েছিলেন ভানুসিংহ। ললিতকলার যে কোন বিভাগে অনুকরণ রসোত্তীর্ণ হবার সেটাই ছাড়পত্র —অ্যাসিড-টেস্ট। কিন্তু তাতেও কি প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞদের কাছে নবীন শিল্পযশপ্রার্থী স্বীকৃতি পায়?

পায় না। অন্তত চ্যাটার্টন পায়নি।

টমাস চ্যাটার্টন-এর (1752-70) জন্ম ব্রিস্টলে, ইংলন্ডে। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতার দেহান্ত ঘটেছিল। মা সেলাই করে গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করতেন। অপরিসীম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে সেই বস্তীর ছেলেটা বাল্য অতিক্রম করে কৈশোরে পা দিল। সাত বছর বয়স থেকেই সে কবিতা লেখে! ব্রিস্টলের সেন্ট মেরী চার্চের ফাদার ওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পেজ-বয়। ঝাড়-পোঁছ করে, বাগানে ফুলগাছে জল দেয়। আর লাইব্রেরী-ঘরের আলমারিগুলো সাফা রাখে। ফাদারের কল্যাণেই অক্ষর-পরিচয়। পড়ত বাইবেল! কিন্তু দুর্দান্ত উৎসাহ ছেলেটার। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় সে গ্রন্থাগারে সহজ বই থেকে ক্রমশ শক্ত বইগুলো পড়তে শুরু করল! শিশু বিদ্যাসাগরের মত রাত জেগে, রাস্তার আলোয়! দশ বছর যখন তার বয়স, তখন লিখে ফেলল একখানা চম্পূকাব্য : On the last Epiphany ; পাণ্ডুলিপি নিয়ে দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু দশবছরের চ্যাঙড়াকে কে পাত্তা দেবে? প্রকাশকেরা হাঁকিয়ে দেয়, কাগজের সম্পাদকেরা ঘরেই ঢুকতে দেয় না। কিন্তু সে হার মানবে না কিছুতেই! পড়তে শুরু করল চার্চ-গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত প্রাচীন কবিদের গাথা। অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি, স্বর্গত পাদরীদের অপ্রকাশিত রচনা। তারপর একদিন! দারুণ এক দুষ্টুবুদ্ধি চাপল তার মাথায়। দুঃসাহসী কিশোর এক বিপদজনক ছলনার আশ্রয় নিল। তিনশ বছর পূর্বেকার ইংরেজী সাহিত্যের ভাব, ভাষা, ছন্দ, ব্যাকরণ অনুকরণ



করে তদানীন্তন রচনা-শৈলীতে সে লিখে ফেলল একখানি অনবদ্য দীর্ঘ গীতিকবিতা: "The Ryse of Peyncteyne in Englande', Wroten by T. Rowlie, 1469, for Master Canynge."

আজ্ঞে হ্যাঁ, 'Englande'-এর এক প্রাচীন কবি কর্তৃক 'Wroten by'! পঞ্চদশ শতকে ঐ বানানেই লেখা হত England অথবা written by!

প্রাচীন তুলট-কাগজে ওল্ড-ইংলিশ হস্তাক্ষরে কবিতাটি আদ্যন্ত পুনর্লিখন করল সযত্নে। কিছুটা জলে ভিজিয়ে, রোদে শুকিয়ে মায় ফায়ার-প্লেসের আগুনে পৃষ্ঠার না-লেখা অংশটা ঝলসে নিল। রগড়ে নিল চার্চের পবিত্র ধূলিতে। তারপর পুরানো দড়িতে পুঁথির আকারে বেঁধে ফেলল। সমগ্র পাণ্ডুলিপিখানি কিশোর কবি পাঠিয়ে দিল স্বনামধন্য আর্ল হোরেস্ ওয়ালপোলকে। মহাপণ্ডিত তিনি—কবি গ্রে এবং স্যার হোরেস্ মান-এর বন্ধু। পাণ্ডুলিপির সঙ্গে 'বানানভুলে ভরা' একখানা ছোট্ট চিঠি। তাতে ব্রিস্টলের সেন্ট মেরী চার্চের এক অজ্ঞাতনামা পেজবয় মহামহিম আর্লকে জানাচ্ছে যে, সে গীর্জার এক ভূগর্ভস্থ 'ক্যাটাকুম্ব্' থেকে ঐ পুঁথিটি উদ্ধার করেছে। পাঠোদ্ধার করতে পারেনি। তাই স্যার ওয়ালপোলকে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

ঠিক যে ভঙ্গিতে হান ভাঁ মীগেরেঁ একখানা ছবি নিয়ে ডক্টর বুন তথা ব্রেডিউস এর দ্বারস্থ হয়েছিল!

স্যার হোরেস ওয়ালপোল স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, যেমন হয়েছিলেন ব্রেডিউস! ওয়ালপোল সেই প্রায়-নিরক্ষর পেজবয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে একটি পত্র দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই একটি সুবিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকায় প্রকাশিত হল ওয়ালপোলের প্রবন্ধ : নিতান্ত ঘটনাচক্রে ব্রিস্টলের সেন্ট মেরী চার্চের এক অশিক্ষিত খিদমদগারের মাধ্যমে তিনি একটি অত্যাশ্চর্য পুঁথি উদ্ধার করেছেন। পঞ্চদশ শতকের এক প্রতিভাময় মহাকবির পাণ্ডুলিপি! অনতিবিলম্বে সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে। ওয়ালপোলের মতে ঐ কবি কালের নিরিখে ইংরাজ কবি জিওফ্রি চশার এবং উইলিয়ম শেক্সপীয়ারের মধ্যবর্তী অবস্থানে। ভবিষ্যদ্বাণী করলেন : দীর্ঘ দুইশত বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর এই অপরিচিত কবি 'রোলী' হতে চলেছেন ইংরাজী কাব্য-ইতিহাসের এক স্থায়ী দিকচিহ্ন! প্রবন্ধে তিনি কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিও দিলেন, উৎসাহটা উদ্দীপিত করতে!

হৈ-হৈ পড়ে গেল পণ্ডিত মহলে! শুরু হয়ে গেল নানান আলোচনা, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ। সবাই উৎগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছে, কবে প্রকাশিত হবে সেই বইটি।

মীগেরেঁর 'ইম্মায়ূস পান্থশালায় যীশু' প্রদর্শিত হয়েছিল বয়ম্যান্স্ সংগ্রহশালায়। মন্ত্রীমহোদয় সে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিলেন। কিন্তু কিশোর-কবি চ্যাটার্টনের সেই চম্পূ-কাব্য কোনদিন ছাপাখানার মুখ দেখল না। কেন জানেন? কারণ সাহিত্যপত্রিকার উচ্ছ্বাস দেখে, ওয়ালপোলের প্রশংসা শুনে উৎসাহিত কিশোর আদ্যন্ত সত্যকথা এবার জানিয়ে দিল। ওয়ালপোলকে চিঠি দিয়ে জানালো—এবার কিন্তু একটাও বর্ণাশুদ্ধি নেই সে পত্রে—জানালো, —কীভাবে দোরে দোরে সে ঘুরেছে তার কাব্যখানি নিয়ে। কোনও প্রকাশক বা সম্পাদককে তার পাণ্ডুলিপি পড়াতেই পারেনি, এবং কীভাবে একক সাধনায় সে ঐ কাব্যখানি রচনা করেছে। ছলনার আশ্রয় নিয়ে স্যার ওয়ালপোলকে পাঠিয়েছে।

ফল কী হল?

ধিক্কার, অপমান, তিরস্কার! ছি-ছি-ছি! এ কী অন্যায় কথা! চ্যাটার্টন চিহ্নিত হল অষ্টাদশ-শতাব্দীর সর্বকুখ্যাত প্রবঞ্চক রূপে!

হবেই! ইতিপূর্বে যেসব সাহিত্য মহারথী কবি রোলীর ছিটে-ফোঁটা উদ্ধৃতি-পাঠে মুক্তকচ্ছ হয়েছিলেন, তাঁরা মর্মান্তিক চটে গেলেন! অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ-লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদল! আত্মাভিমানে আঘাত লাগলো সবার। এক-ফোঁটা একটা চার্চের পেজবয় এভাবে ডি.লিট., ডি. ফিল, ডন-দের নাকে ঝামা ঘষে দেবে! ইয়ার্কি নাকি! ওঁরা সমবেতভাবে প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হলেন!

এ আঘাত সহ্য করতে পারল না কিশোর-কবি। ব্যর্থ মর্মাহত চ্যাটার্টন মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে আত্মহত্যা করলেন। মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে নাকি তিনি লিখেছিলেন—"আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী ইংরাজী-সাহিত্যের বর্তমান যুগের তথাকথিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা!"

ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি।

এবার যেমন পণ্ডিতপ্রবর ডোকোয়েন বললেন, মীগেরেঁর পক্ষে ঐ 'ইম্মেয়ুস্ পান্থশালায় যীশু' ছবিখানি আঁকা সম্ভবপর নয়, সেটা এতই উচ্চমানের—সেবারও একদল পণ্ডিত বলেছিলেন — ঐ চ্যাটার্টন-ছোকরার পক্ষে 'রোলীর' কাব্যগ্রন্থটি রচনা করা সম্ভবপর নয়, —সেটা এতই উচ্চমানের! তাঁদের মত : রোলী নামের এক শক্তিশালী কবি সত্যই ছিলেন পঞ্চদশ শতকে। তাঁর ঐ কাব্যখানি সত্যসত্যই পড়েছিল সেন্ট-মেরী চার্চের ভূগর্ভস্থ 'ক্যাটাক্যুম্ব'-এ! ও ছোকরা পদ্য-টদ্য লিখত—সে পাণ্ডুলিপিখানি খুঁজে পায়। পড়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না। পারবে কোথেকে? স্কুলে-কলেজে পড়েনি তো? অথচ লোভটুকু ষোলআনা! যেই শুনল—কাব্যটি ইংরাজী সাহিত্য-ইতিহাসে এক অনবদ্য সংযোজন হতে চলেছে, অমনি ফস্ করে বলে বসল, আজ্ঞে, ওগুলি এই অধমেরই রচনা!

চ্যাটার্টনের আত্মহত্যার পর দীর্ঘ একশ বছর ধরে এ বিতর্কের সমাধান হয়নি। একদলের বিশ্বাস—কবির মৃত্যুকালীন জবানবন্দি মিথ্যা হতে পারে না, অপর দলের বক্তব্য—সেন্টিমেন্টালিটির স্থান নেই নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্যে-বিচারে। এ মহান সাহিত্য একটি অকালপক্ক অশিক্ষিত কিশোরের কলম থেকে জন্মাতে পারে না!

সব বিতর্কের যবনিকাপাত ঘটল 1871 সালে। পণ্ডিতপ্রবর স্কীট দীর্ঘদিন গবেষণা করে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করলেন : পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'রোলী' নামে কোন কবি বাস্তবে ছিলেন না। ঐ পাণ্ডুলিপি অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত, রচনাটি ঐ অনাদৃত, অপমানিত কবির—যে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল! এই একশ বছরে কিশোর কবির তরতাজা দেহটা কবরের নিচে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। তবু স্কীট-এর গবেষণা-গ্রন্থটি যেদিন প্রকাশিত হল—দুনিয়া যেদিন নতমস্তকে মেনে নিল—মহা-মহা রথীরাই ভুল করেছেন, চ্যাটার্টন প্রবঞ্চক নয়—সেদিন কফিনের ভিতর ঐ 'মৃৎ হইয়াছে অঙ্গ যাহার' সে বোধ করি মৃদঙ্গের তেহাই তুলে দ্রিমিদ্রিমি বোলে অট্টহাস্য করে উঠেছিল।

বল্তে ভুলেছি—কবি চ্যাটার্টনের মৃতদেহ এই একশ বছর ধরে শায়িত ছিল যে কবরখানায়, তার নাম : 'শ্যু-লেন ওয়্যারহৌস্ পপার্স পিট'! সাদা বাঙলায় 'মুচিপাড়ায় গুদামঘর-সংলগ্ন নিঃস্ব ভবঘুরেদের বেওয়ারিশ কবরখানা'।

তফাৎ আছে। মানছি। হস্তলাঘবতা সাফল্যমণ্ডিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চ্যাটার্টন আত্মঘোষণা করেছিল



ভাঁ মীগেরেঁ করেনি। চ্যাটার্টন তার প্রবঞ্চনার ফসল ভাড়াঁরে তুলতে পারেনি, মীগেরেঁ পেরেছিল। কিন্তু সাদৃশ্যগুলিও অনস্বীকার্য : চ্যাটার্টন দুনিয়ার কাছে চেয়েছিল একটু স্বীকৃতি, কবি হিসাবে। পায়নি। মীগেরেঁও চেয়েছিল সহজ সরল পথে একটু স্বীকৃতি, চিত্রশিল্পী হিসাবে। আর দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে দুই প্রবঞ্চকেরই এক হাল : কপর্দকহীন, দেউলিয়া!

হবে না? পাপের ফল বাতাসে নড়ে! মাথার উপর ভগবান আছেন না ? হুঁ হুঁ বাবা!

## ॥ বারো ॥

হান ভাঁ মীগেরেঁর শেষ-বিচারটি অনবদ্য!

যেন লুই ক্যারল বা সুকুমার রায়ের পরিকল্পনা।

আসামী সেখানে প্রাণপণ চাইছে : তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হক!

প্রসিকিউশন চাইছে : ওকে বেকসুর খালাস দেওয়া হক!

যেন আসামী বলতে চায় : হুজুর! জেল দিন, ফাঁসি দিন—কিন্তু 'রায়' দেবার সময় লিখে দেবেন—ঐ চৌদ্দখানি ছবির একখানাও হাল্‌জ্-তেবুর্গ-ভেরমেয়ার আঁকেনি! স-ব, সবই অধমেরই আঁকা!

আর প্রসিকিউশন যেন বলতে চাইছে : অমন কাজটি করবেন না ধর্মাবতার! বেটাকে জেল দিন, ফাঁসি দিন, যা ইচ্ছে করুন—কিন্তু ট্যাক্স-পেয়ারের অর্থে সদাশয় সরকার বাহাদুর ঐ যে ছবিগুলি কিনেছিলেন, ওগুলি সাচ্চা বলে রায় দিন। না হলে বড় বে-ইজ্জতে পড়ে যাব যে আমরা, হুজুর!

ইতিমধ্যে ইনকাম-ট্যাক্স বিভাগ এক বিরাট করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে আসামীর ঘাড়ে। মীগেরেঁ বে-আইনীভাবে যে অর্থোপার্জন করেছে কয় বছরে তার উপর। আর আর্ট-মন্ত্রক তাকে বলেছে, মীগেরেঁ যেন নকল-ছবি বাবদ অন্যায়ভাবে উপার্জনের অর্থটা ফেরত দেয়! আর্ট-মন্ত্রককে অর্থটা প্রত্যর্পণ করলে কেন তাকে ইনকাম-ট্যাক্স দিতে হবে, প্রশ্নটা কেউ ভেবে দেখছে না। দেউলিয়া মানুষটা তো কাউকেই কোন অর্থ দিতে পারবে না!

মিনিস্টার অব জাস্টিস্ বললেন—একটা কমিশন গঠন করা হক। সর্বজনমান্য বিশেষজ্ঞ দল বিচার করে প্রথমে বলুন, ঐ ছবিগুলি মীগেরেঁর আঁকা নকল ছবি কিনা!

খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা। তেমন-তেমন সর্বজনমান্য বিশেষজ্ঞ পাওয়া যাবে কোথায়?

সকলেই যে কোন-না-কোন সময়ে বলে বসে আছেন, সেগুলি 'অরিজিনাল'! এ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, গ্রন্থ লিখেছেন, মায় তাঁদের সার্টিফিকেট-মোতাবেক সরকার এবং বিভিন্ন সংগ্রহশালা লক্ষ লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে সেগুলি খরিদ করেছে! এখন কোন্ লজ্জায় তাঁরা বলেন—এগুলি জাল! মীগেরেঁর উকিল তো আদালতে ছেড়ে কথা বলবে না। অনায়াসে সে প্রমাণ করে দেবে এক্সপার্ট হিসাবে সাক্ষী দিতে তারা অনুপযুক্ত! একই ছবিকে আজ বলে 'অরিজিনাল', কাল বলে 'নকল'!

তাই কমিশন গঠন করতেই লেগে গেল সাত-আট মাস!

বন্দী ইতিমধ্যে বারে বারে দরখাস্ত করেছে : হুজুর! আমি দোষী! আমাকে শাস্তি দিন।

যা হোক, অবশেষে জাস্টিস্ উইয়ার্দের চেয়ারম্যানশিপে একটি এক্সপার্ট-কমিশন গঠিত হল

ছেচল্লিশ সালের এগারোই জুন। তার মুখপাত্র কোরম্যান-সাহেব।

মজার কথা—হল্যান্ডের সাধারণ মানুষ কিন্তু এতদিনে আসামীর পক্ষে চলে গেছে! প্রথমে তারা চেয়েছিল—আসামীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। এখন সে ওদের 'হিরো'! এটাও সরকারকে ভাবনায় ফেলেছে।

জনমানসের এ পরিবর্তনটা কিন্তু প্রত্যাশিত। পুলিস প্রথমে বলেছিল— মীগেরেঁ একজন নাৎসী চর! সে জাতীয়-সম্পদ নাৎসীদের বিক্রয় করে দেবার ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীদের নাম তাই গোপন রাখতে চাইছে। পুলিস ইতিমধ্যে একটি অত্যন্ত জোরালো প্রমাণও খুঁজে পেয়েছে —যে কথা সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দেওয়াও হয়েছে। হান ভাঁ মীগেরেঁর একটি স্কেচ-বই, পেন-অ্যান্ড-ইঙ্কে ঠাশা! তার প্রথম পাতায় লেখা আছে: "Dem gelieten Fuerher in dankbarer Auerkennwg— Han van Meegeren।"*

ঘটনা বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে। তখন হল্যান্ডের মানুষ নাৎসী-জার্মানীর বিষজর্জরিত। ফলে প্রথম দিকে সংবাদপত্রে লেখা-পত্রে আমস্টার্ডামের সাধারণ মানুষ বিষোদ্গার করেছিল আসামীর বিরুদ্ধে! জেল নয়, লোকটার ফাঁসি হওয়া উচিত।

তারপর তিল তিল করে প্রমাণিত হয়ে গেল—মীগেরেঁ ঐ দুষ্টচক্রের ধারে-কাছেও ছিল না। পুলিস সে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে—স্কেচ-বইয়ের প্রথম পাতায় হস্তাক্ষরটি মীগেরেঁর নয়। খাতাখানা বাজার থেকে কিনে কোনও নাৎসী সমরনায়ক মীগেরেঁর স্বাক্ষরের সামনে ঐ কয়টা কথা লিখে তার ফুরারকে উপহার পাঠিয়েছিল। এতদিনে মীগেরেঁ হয়ে গেছে অখ্যাত, অবজ্ঞাত প্রত্যাখ্যাত শিল্পযশপ্রার্থীদের 'হিরো'।প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী হাতে গোনা যায়, প্রত্যাখ্যাতরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ! তারা ওর মধ্যে খুঁজে পেল তাদের নিজেদের পুঞ্জীভূত অপমানের, অভিমানের মূর্ত প্রতীক! ওরা যা পারেনি ওদের 'হিরো' তাই পেরেছে—ঐ তথাকথিত আর্ট-কনৌশারদের নাকে ঝামা ঘষে দেওয়া।

দীর্ঘ নয় মাসে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কমিশন সর্বসম্মতসিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। দাখিল করলেন তাঁদের রিপোর্ট : হ্যাঁ, ঐ ছবিগুলি হান ভাঁ মীগেরেঁরই আঁকা! এতদিন বিচারের আশায় আসামী জেল-হাজতে পচছে । জামিন পায়নি। তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। বার দুয়েক তাকে ভ্যালেরিয়াম স্বাস্থ্যনিবাসের 'ইন্টেন্সিভ কেয়্যার ওয়ার্ডে' নিয়ে যেতে হয়েছে। মিনিস্টার অব জাস্টিস্ মহামান্য আদালতকে তাগাদা দিলেন : তাড়াতাড়ি করুন। লোকটা বেঁচে থাকতে থাকতেই যেন শতাব্দীর সর্বকুখ্যাত সাজা হয়ে যায়! অবশেষে বসল সেই বিচার-সভা। সাতচল্লিশ সালের উনত্রিশে অক্টোবর।

ফোর্থ-চেম্বার এ বিচারালয়ের বিশালতম কক্ষ। তবু সব দর্শনার্থীর ঠাঁই হয়নি। আদালত-কক্ষটাকে আজ মনে হচ্ছে যেন একটা আর্ট-গ্যালারি। চার দেয়ালে একের পর এক বিশালায়তন সব তৈলচিত্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের : ফ্রান্স হালজ্ দি হ, ভেরমেয়ার...না, না, কী-সব আবোল-তাবোল বক্‌ছি? সর্বজনশ্রদ্ধেয় আর্ট-কনৌশার দ্বারা গঠিত কমিশন তো ইতিপূর্বেই বলেছেন—ওগুলো হচ্ছে বিংশশতাব্দীর সর্বকুখ্যাত প্রবঞ্চকের হস্তলাঘবতা। তা-হোক, বছর-খানেক আগেও ওগুলি বিশ্বের বিখ্যাত সব সংগ্রহশালায় শোভিত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ

* "পরমপ্রিয় ফুরারকে সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ—হান ভাঁ মীগেরেঁ।



ডলারে তাদের কেনা-বেচা হয়েছে, ক্যাটালগে ছাপা হয়েছে তাদের কৌলীন্যের পরিচয়। ঐ ছবিগুলির উপর থিসিস্ লিখে যাঁরা ডক্টরেট পেয়েছেন এবং যাঁরা সেসব থিসিস্ পরীক্ষা করে ডিগ্রি দিয়েছেন, তাঁরা তো কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াননি! তাঁরা তো অপমানিত, নিগৃহীত, দেউলিয়া হয়ে যাননি ঐ পলিতকেশ আসামীর মতো।

মাঝখানে বিচারকের আসন। তাঁর পিছনে হল্যান্ডের মহারানীর একটি বড় ছবি। কিন্তু সেটা আজ ম্লান দেখাচ্ছে, ক্ষুদ্রায়তন হয়ে গেছে—কারণ তার দু-পাশে দুখানি প্রকাণ্ড মাস্টারপিস্ : 'ইম্মায়ুস পান্থশালায় যীশু' এবং 'শেষ সায়মাশ'। যাদের মূল্য তদানীন্তন বাজারদরে ছয়লক্ষ পাউন্ড। বিপরীত প্রাচীরে যেন নূতন করে পন্টিয়াস পীলেতের বিচারের প্রতীক্ষায় : যীশু— 'যুবক যীশু'। যে ছবিখানি আসামী পুলিস-প্রহরায় এঁকেছে প্রমাণ দিতে যে, ভেরমেয়ারেরও রেজারেকশান হয়েছে!

ঠিক বেলা দশটায় প্রহরীর কাঁধে ভর দিয়ে অসুস্থ ভাঁ মীগেরেঁ এসে বসল কাঠগড়ার চেয়ারে। পরমুহূর্তেই প্রবেশ করলেন অনারেব্‌ল্ জাস্টিস বৌল। সবাই উঠে দাঁড়ায়। বিচারক তাঁর আসন গ্রহণ করায় সবাই আবার বসে।

প্রেসের লোক আজ এসেছে ; কিন্তু আদালতকক্ষের ভিতর তাদের ফটো তোলা বারণ। লর্ড কিলব্রাখেনের গ্রন্থ পাঠে জানি—দর্শকদলে উপস্থিত ছিলেন আসামীর স্ত্রী জোহানা আর আসামীর কন্যা ঈনেভ।

নকীব প্রশ্ন করে : আপনার নাম আঁরিকুস আন্তোনিয়ুস ভাঁ মীগেরেঁ?

আসামী স্বীকার করল তার পিতৃদত্ত নামটা।

নকীব অতঃপর পাঠ করে শোনালো আট পাতার অভিযোগপত্রটি। পিনাল কোড-এর 326B এবং 326B ধারা মোতাবেক অর্থাৎ প্রবঞ্চনার মাধ্যমে অন্যায় উপার্জন ও সই জাল করা।

বিচারক এবার প্রশ্ন করেন : অভিযুক্ত । তুমি অপরাধদ্বয় স্বীকার করছ, না কর না?

আসামী দৃঢ়কণ্ঠে বললে, আমি বহুবার বলেছি, আজও বলছি : হ্যাঁ!

বিচার চলেছিল বারই নভেম্বর পর্যন্ত।

বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। আসামী তার অসুস্থ দেহ সত্ত্বেও বরাবর প্রফুল্ল ছিল। মাঝে মাঝে শাণিত যুক্তিতে নিজেই সওয়াল করেছিল—তীব্র আক্রমণে ভূতলশায়ী করেছিল সাক্ষীদের।

— একথা কি সত্য যে, বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপনি নিজেই একদিন ঐ ছবিখানি 'অরিজিনাল ভেরমিয়ার' বলে সার্টিফাই করেছিলেন, আর আপনার সুপারিশ মোতাবেক সরকার ঐ ছবিখানা বারো লক্ষ গিল্ডার্স দিয়ে কিনেছিল?

— হ্যাঁ, সত্য!

— আপনি বিশেষজ্ঞ-হিসাবে পরীক্ষা করে রায় দিয়ে আপনার ন্যায্য 'প্রফেশানাল ফী' হাত পেতে গ্রহণ করেছিলেন?

— অব্‌জেকশন য়োর অনার। ইর্‌রেলিভ্যান্ট। —আপত্তি জানায় বিপক্ষের উকিল।

— অবজেকশান ওভাররুল্‌ড। সাক্ষী জবাব দিন। —বিচারক রায় দেন।

— আজ্ঞে হ্যাঁ, নিয়েছিলাম।

মীগেরেঁ পুনরায় জ্বলে ওঠে, এবং বর্তমানে আপনি বিশেষজ্ঞ হিসাবে বলছেন, এ ছবিটি নকল? এবারও আপনি বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপনার ফী হাত পেতে নিচ্ছেন?

— আজ্ঞে হ্যাঁ!
মীগেরেঁ বিচারকের দিকে ফিরে একটি বাও করে বলেন, এমন বিশেষজ্ঞকে আমার কোন প্রশ্ন নেই হুজুর!
বারই নভেম্বর বিচারক রায় দিলেন : গিল্‌টি! উভয় অপরাধই প্রমাণিত। সেজন্য অপরাধীকে তিনি এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাবাসের দণ্ড দিলেন। আইন-মোতাবেক এটিই ন্যূনতম শাস্তি! শতাব্দীর সর্বকুখ্যাত প্রবঞ্চককে এর কম শাস্তি দেবার ক্ষমতা স্বয়ং বিচারকেরও নেই।
অর্থদণ্ডের প্রশ্নই ওঠে না। আসামী ইতিপূর্বেই 'দেউলিয়া'।
বিচারক আরও আদেশ দিলেন—তৈলচিত্রগুলি যেখান থেকে সংগৃহীত হয়েছে সেখানে ফেরত পাঠাতে! শুধু অল্ট-ঔসী থেকে উদ্ধার পাওয়া 'অ্যাডলটারেস্'-খানা হবে রাজকোষের সম্পত্তি। আসামীকে আপীল দায়ের করার জন্য দুই সপ্তাহের সময় দেওয়া হল।
আসামী দৃঢ়কণ্ঠে ওখানেই বলে এল : দেয়ার শ্যাল বি নো অ্যাপীল!
অনেক পরে জানা গেছে, জেলখানায় অজ্ঞাতনামা এক অতি উচ্চপদস্থ সরকারী-অফিসার মীগেরেঁর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল টাইপ করা একটি আবেদনপত্র —'মার্সি পিটিশন'। তিনি বস্তুত ছিলেন হল্যান্ডের মহামান্যা মহারানীর ব্যক্তিগত দূত। মহারানী নাকি স্বয়ং ইচ্ছাপ্রকাশ করছেন—বন্দীকে মুক্তি দিতে। বিশেষ ক্ষমতা বলে তিনি যে কোন বন্দীকে মুক্তি দিতে পারেন, আবেদনপত্রটি পেলেই।
যে প্রবঞ্চক হাল্‌জ্, দি-হু, কিম্বা ভেরমেয়ারের স্বাক্ষর করতে সমর্থ সে নিজ নামটা ঐ কাগজের তলায় সই করতে পারল না। বললে, মাপ, করবেন! তা আমি পারব না! মহারানীকে বলবেন, তাঁর এই ক্ষমাসুন্দর প্রস্তাবটি হস্তগত হবার আগেই আমি অন্তরে আর একটি আমন্ত্রণবার্তা পেয়েছি। মহারানীর মায়ের কাছ থেকে—
বিস্মিত অফিসার অবাক হয়ে বলেন, মহারানীর মা! তার মানে?
— তাঁকে বলবেন, তিনি বুঝবেন! মা মেরী আমাকে কোলে টেনে নিতে সম্মত হয়েছেন। 'প্রবঞ্চক' বলে দূরে ঠেলে দেননি। অচিরেই এই কারা যন্ত্রণার অবসান হবে আমার।
তাই হল।
মাত্র দেড়মাসের মধ্যে ওঁকে স্থানান্তরিত করতে হল হাসপাতালে। সেখানে ঊনত্রিশে ডিসেম্বর ঐ প্রবঞ্চক সব প্রবঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পেল। মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিল একটি ফ্রেঞ্চ মহিলা—যেন নিকট-আত্মীয়! আর কিছু না, ঐ আর্টিস্টের নজরে পড়েছিল সেই অনাত্মীয়া মেয়েটির মুখের আদল তার একটি প্রিয়জনের মিষ্টি মুখের আদলে!

"গল্পের নায়ক-নায়িকাকে যদি ভালবাসতে না পার তবে কলমকে অব্যাহতি দিও—সেটা কলম-কালি আর কালের অপব্যয়।"—এ পরামর্শ অনুজ লেখকদের দিয়ে থাকি। নিজেও মেনে চলি। হান ভাঁ মীগেরে'—যত বড় ঘৃণ্য প্রবঞ্চকই হোক না কেন—আমি তাকে ভালবেসেছিলাম!
যে-অর্থে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান জগতের সর্বকুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক'কে ভালবেসেছিলাম, ঠিক সে-অর্থে হয়তো বিংশ শতাব্দীর চিত্রজগতের সর্বকুখ্যাত 'প্রবঞ্চক'কে ভালবাসিনি। 'বিশ্বাসঘাতক' ডক্টর ক্লজ ফুকস্-এর জন্য ছিল শ্রদ্ধা, আর 'প্রবঞ্চক' ভাঁ মীগেরেঁর প্রতি



নিছক ভালবাসাই!
কিছুতেই ভুলতে পারি না সেই উনিশ শো ষোল সালে দেখা তরুণ শিল্পযশপ্রার্থীকে!
যে ছোকরা এসেছিল ঘড়ি-আংটি বাঁধা-দেওয়া তার একক প্রদর্শনীর আমন্ত্রণপত্রটি হাতে হাতে বিলি করতে আমার এই ভবানীপুর চক্রবেড়িয়া বাড়িতে। বলেছিল, আসবেন স্যার দয়া করে।
আমি বলেছিলুম, আমাকে কেন ভাই? আমি ইঞ্জিনিয়ার-মানুষ...তাছাড়া আমি তো কোন পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত নই...
— জানি! তবু আসবেন!
উনিশ শো ষোল সালে অবশ্য আমার জন্মই হয়নি। না হোক, তাতে কী? ঐ মীগেরেঁ ছোকরাকে তো তারপরেও কতবার দেখেছি। আপনারাও নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন তাকে—ট্রামে-বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে যেতে যেতে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ময়দানে, যাদুঘরের উল্টোদিকে, হাওড়া-স্টেশনে, রুমাল বিছিয়ে স্কেচ করে চলেছে। দেখেননি? ইদানিং তাকে বইমেলাতেও নিশ্চয় দেখেছেন। মনে পড়ছে না? সেই যে রোগা, লম্বা, একহারা চেহারা, একমাথা চুল, এক মুখ দাড়ি, গায়ে তাপ্পি দেওয়া আধময়লা পাঞ্জাবি, পায়ে চপ্পল, কাঁধে গেরুয়ারঙের শান্তিনিকেতনী ঝোলা ব্যাগ? ঠোঁটে ঝুলছে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া চারমিনার অথবা লালসুতোর বিড়ি?
একটু লক্ষ্য করে দেখবেন—চিনতে পারবেন মীগেরেঁকে। বিশেষ করে লক্ষ্য করে দেখবেন ওর চোখ দুটো। সে চোখের দৃষ্টিতে কখনো জঠরাগ্নির—দীপক, কখনো বেদনার—মল্লার, আবার কখনো বা লাজুক—বাহার!
আমাকে ও ভোলেনি, ভুলতেও দেয়নি। কী জানি কোথা থেকে ঠিকানা জোগাড় করে আজও মাঝে মাঝে চিঠি পাঠায়। সাইক্লোস্টাইল-করা হাতে-লেখা আমন্ত্রণ-লিপি : আমি হান ভাঁ মীগেরেঁ। একটি একক-প্রদর্শনীর আয়োজন করা গেছে। দয়া করে একবার দেখতে আসবেন?
কখনো সময় করে উঠতে পারি না। কখনো যাই, দেখে আসি। গেলে ও দারুণ খুশি হয়। আমি যখন ওর আঁকা স্কেচ-জলরঙ-তেলরঙের ছবিগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকি ও থাকে আমার পাশে-পাশে। বিদায় নেবার উপক্রম করলেই ভিজিটার্স-বুকখানা মেলে ধরে বলে : যা হোক কিছু লিখে দিন!
আমি পকেট থেকে কলমটা বার করবার উপক্রম করতেই আবার তাড়াতাড়ি একটা চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দেয়। বলে, গলাটা আগে ভিজিয়ে নিন দাদা, কমেন্টস্ লেখা তো আছেই!
তখন ওর চোখে মল্‌হারী-দৃষ্টি।
আবার চা-পানান্তে যখন ওর খাতায় মন্তব্য লেখার উপক্রম করি তখন হঠাৎ নজরে পড়ে ও আমাকে ফেলে ছুটে যাচ্ছে দ্বারের দিকে। কোনও নামজাদা বাজারে-পত্রিকার পেশাদার সমালোচক এলেন হয়তো! আমি কী লিখলাম-না-লিখলাম তা তখন তুচ্ছ হয়ে গেছে। ও তখন ঐ শিল্প পণ্ডিতের পিছু পিছু ঘুরছে। সশঙ্ক চিত্তে! উনি না সর্বসমক্ষে বলে বসেন : অন্য কোন চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখ না বাপু—এখনো সময় আছে।
তবে হ্যাঁ, কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে অর্ধ শতাব্দীতে। ওকথা শুনে ও আর লজ্জায় মেদিনী-নিবদ্ধ দৃষ্টি হয় না। তখন লক্ষ্য করে দেখেছি, মীগেরেঁর চোখে জ্বলে ওঠে : দীপকরাগিণী!